দাম : দশ টাকা

চীন ও পাকিস্তানে প্রকৃত গণতন্ত্রই আঞ্চলিক শান্তির চাবিকাঠি

পৃঃ - ১১

স্বস্তিকা

পাকিস্তানের বিলুপ্তপ্রায় হিন্দু মন্দির

পৃঃ - ১৪

৬৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ২১ নভেম্বর ২০১৬।। ৫ অগ্রহায়ণ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

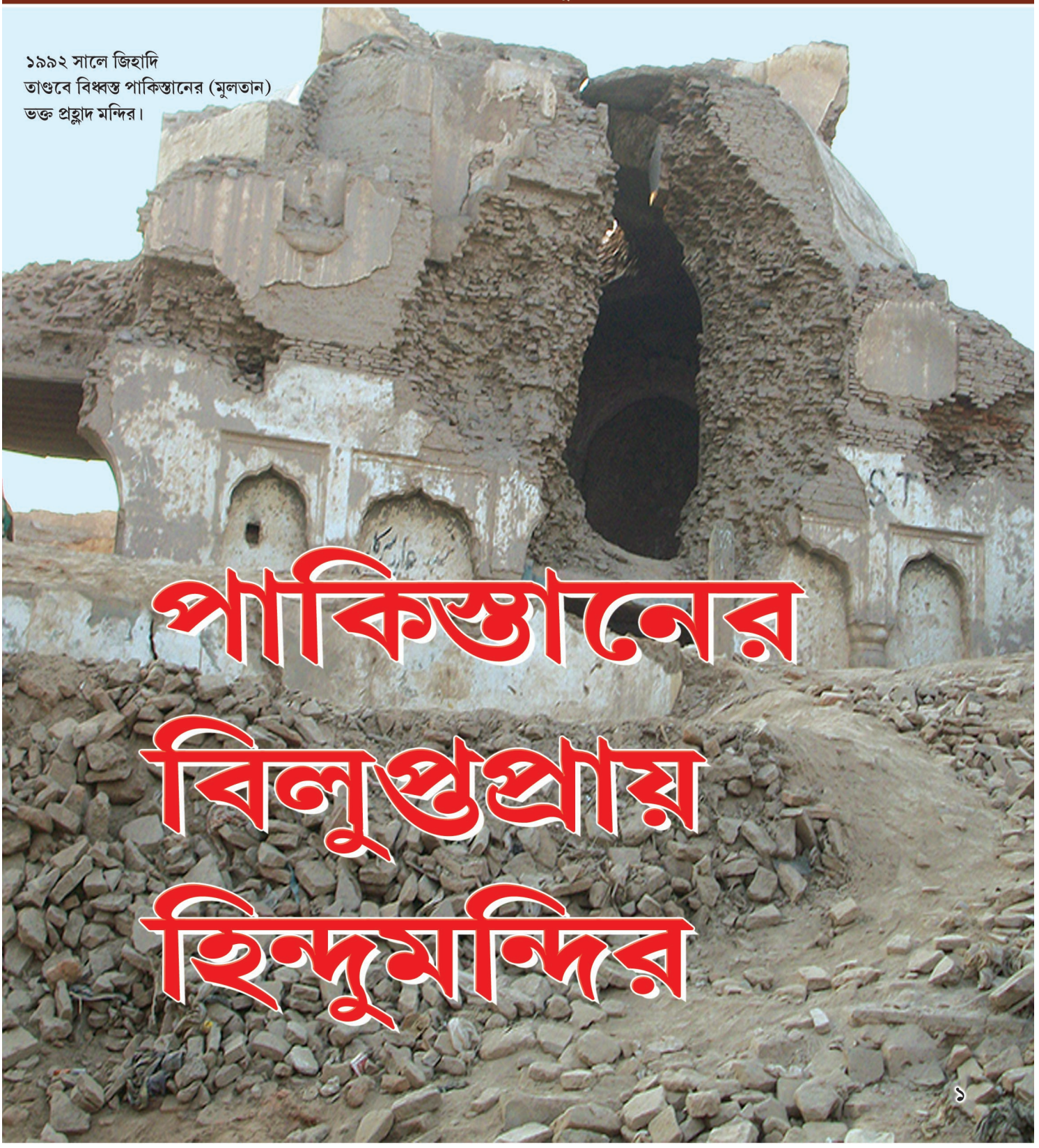

১৯৯২ সালে জিহাদি তাণ্ডবে বিধ্বস্ত পাকিস্তানের (মুলতান) ভক্ত প্রহ্লাদ মন্দির।

পাকিস্তানের বিলুপ্তপ্রায় হিন্দুমন্দির

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২১ নভেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬

সাম্প্রতিক ▯ ৭

খোলা চিঠি : ঠাকুর ঘরে কে রে? দিদি তো কলা খাননি... ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

ঘরে বস্তাবন্দি অচল টাকা, রাগ তো হবেই ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

চীন ও পাকিস্তানে প্রকৃত গণতন্ত্রই আঞ্চলিক শান্তির চাবিকাঠি ▯ সুব্রত ভৌমিক ▯ ১১

পাকিস্তানের বিলুপ্তপ্রায় হিন্দুমন্দির ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৪

এক নিঃসঙ্গ ঈশ্বরী : দেবী সারদা ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২১

ভক্তবৎসলা মা আনন্দময়ী ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

'আপ'কে নিয়ে স্বপ্নভঙ্গ— কী শিখলাম আমরা ▯ ২৭

তিন তালাকের প্রতিবাদ আসছে মুসলমান সমাজের ভেতর থেকেই ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ২৯

ব্রাহ্মণবাড়িয়া অধ্যায় : এবারও কি বিচারহীনতার সংস্কৃতি দেখবে বাংলাদেশ? ▯ ৩১

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার উপর এক নয়া পশ্চিমি ষড়যন্ত্র ▯ নারায়ণ চন্দ্র দে ▯ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬** ▯ **শব্দরূপ : ৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪১-৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নোট-বাতিল : কালো টাকার বিরুদ্ধে এক সাহসী সিদ্ধান্ত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলকে চমক দিয়ে পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের যে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কয়েকটি রাজনৈতিক দল তা নিয়ে ঘোঁট পাকালেও সাধারণ মানুষ দু-হাত তুলে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কালো টাকা উদ্ধারের এই প্রয়াস দেশ ও দুনিয়ায় কী প্রভাব ফেলবে তা নিয়েই এই সংখ্যায় আলোচনা করেছেন প্রণয় রায়, অম্লান কুসুম ঘোষ, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, এন সি দে প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাহসী সচেতন সুদৃঢ় সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ

পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের যে সাহসী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তটি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত গোপনীয়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কেবল প্রশংসনীয় নয়, অভিবাদনযোগ্যও বটে। ইহার ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে তিন প্রকার লাভ হইবে। প্রথমত, জাল নোট ভারতীয় অর্থনীতিকে আর প্রভাবিত করিবে না। দ্বিতীয়ত, কালো টাকার মজুতদারেরা সর্বস্বান্ত হইবেন। তৃতীয়ত, আয়কর ফাঁকির প্রবণতা কমিবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে দেশে জাল টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি চলিতেছে। পাঁচশো ও হাজার টাকা বাতিলের পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা খবর দিয়াছেন পাকিস্তানের করাচি, পেশোয়ার কিংবা বালুচিস্তানের মতো স্থানে যেখানে ভারতীয় জাল টাকা মুদ্রণের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে। ফলতঃ পাকিস্তান যে ভারতীয় বাজারে জাল নোট প্রবেশ করাইয়া এদেশের অর্থনীতিকে বিষম সংকটের আবর্তে ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধজয়ের পরিকল্পনা করিয়াছিল মোদী সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে সবচেয়ে ক্ষয়ক্ষতি তাহাদেরই হইয়াছে। ক্ষতি আরও একশ্রেণীর মানুষের হইয়াছে। যাহারা দেশের সাধারণ নাগরিকের সহিত প্রতারণা করিয়া বিপুল মুনাফা অর্জন করিয়াছে এবং সেই নগদ ধন গোপন স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। মোদীর নোট বাতিল সংক্রান্ত ঘোষণাটি প্রকাশিত হইবার পরই তাহাদের মস্তিষ্ক খারাপ হইবার জোগাড়। তাহারা বুঝিয়াছে এই সঞ্চিত অর্থরাশি মূল্যহীন হইয়াছে। প্রতিটি সৎ নাগরিকের কর্তব্য নিয়মমাফিক আয়কর জমা দেওয়া। এই সুঅভ্যাসটি প্রতিটি দেশবাসীর মধ্যে অদ্যাবধি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত এই অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিবে কোনো সন্দেহ নাই।

ভারতীয় অর্থনীতি এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী লাভবান হইবে। মূল্যবৃদ্ধি কমিবে, কালোবাজারি বন্ধ হইবে, সন্ত্রাসবাদীদের অর্থনৈতিক উপদ্রব এড়াইয়া ভারতীয় অর্থনীতি বিকশিত হইবে, আপন গতিতে চলিবার সুযোগ পাইবে। নরেন্দ্র মোদীর এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে জনমুখী, গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষার তাগিদে লওয়া হইয়াছে। দেশবাসীও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। গত ৮ নভেম্বর রাত্রিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জাতির উদ্দেশে এতদ্‌সংক্রান্ত ভাষণটির পর একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল ও একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের উস্কানিতে সাধারণ দেশবাসী সাময়িক বিচলিত বোধ করিলেও; যখন তাহারা বুঝিলেন তাহাদের অর্থ সুরক্ষিত, এ সিদ্ধান্ত কেবল কালোবাজারি ও জাল নোট পাচারকারীদের চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে লওয়া হইয়াছে তখন তাহাতে যে সাড়া মিলিয়াছে তাহা বলিবার ভাষা নাই। গোপনীয়তা বজায় রাখিতে সাময়িকভাবে নূতন নোট ও পুরাতন একশো কিংবা পঞ্চাশ টাকার নোট জোগানের যে খামতিটুকু দেখা দিয়াছে তাঁহারা হাসিমুখে তাহা মানিয়া লইয়াছেন। ১০ নভেম্বর ব্যাঙ্ক খুলিলে কুরুক্ষেত্র হইবে বলিয়া যাহারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের বাড়া ভাতে ছাই ঢালিয়া জনগণ সহাস্যে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়াইয়াছেন। দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে দুর্নীতিপরায়ণ কিছু রাজনৈতিক দল ও কালোবাজারি সংবাদমাধ্যমের ইন্ধনই স্পষ্ট।

দলমত নির্বিশেষে সাধারণ দেশবাসী এই মুহূর্তে দু'টি ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। একদিকে রহিয়াছেন দেশের সৎ নাগরিকবৃন্দ। যাঁহাদের সংখ্যা নব্বই শতাংশের বেশি। অন্যদিকে রহিয়াছে অসৎ নাগরিকেরা। যাঁহাদের সংখ্যা দশ শতাংশেরও কম। এই সাহসী, সচেতন, সুদৃঢ়, সুপরিকল্পিত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফল যে ফলিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তূপে টাকার বস্তা উদ্ধারে কিংবা নদীবক্ষে ভাসমান শ্যাওলা জমা অর্থরাশির মধ্যে বা ভারতবর্ষের বৃহত্তম আর্থিক কেলেঙ্কারির নায়কদের মাত্র চার হাজার টাকার জন্য ব্যাঙ্কে লাইন দেওয়ার মধ্য দিয়া। অসততার বিরুদ্ধে সততার যুদ্ধে ভারতবর্ষের নাগরিকগণ যে নরেন্দ্র মোদী সরকারের পার্শ্বেই রহিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দেশবাসীগণের এই আবেগকে সম্মান দিয়া নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত-পূর্ব ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি আর ভবিষ্যতে যাহাতে না হয়, কেন্দ্রীয় সরকার তাহা সুনিশ্চিত করুন।

সুভাষিতম্

ঊর্ধ্বাবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে।।

আমি (ব্যাসদেব) দু'হাত তুলে চিৎকার করে বলছি যে, ধর্ম থেকেই অর্থ ও কাম চরিতার্থ হবে অথচ তা (ধর্ম) কেন গৃহীত হচ্ছে না।

প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষা

আসন্ন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে চারটিতেই এগিয়ে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আসন্ন নির্বাচনী যুদ্ধে বিজেপি এই মুহূর্তে অশ্বমেধের ঘোড়া। দিকে দিকে নরেন্দ্র মোদীর জয় জয়কার। সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকাগোষ্ঠী এবং অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে সংগঠিত উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড মণিপুর, গোয়া এবং পঞ্জাবের প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য। মোট ৩৭,৮৬৬ জন ভোটারের সঙ্গে কথা বলে সমীক্ষকরা জানিয়েছেন, এখনই যদি নির্বাচন হয় তাহলে বিজেপি পাঁচটির মধ্যে চারটি রাজ্যেই ক্ষমতায় আসতে পারে।

জনপ্রিয়তার এই বিস্ফোরণের পিছনে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের সাম্প্রতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উরির সেনাছাউনিতে পাক মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীদের মাঝরাতে আকস্মিক হামলার পর ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নেয়। উত্তরপ্রদেশের ৯০ শতাংশ, পঞ্জাবের ৮৮ শতাংশ এবং উত্তরাখণ্ডের ৭৭ শতাংশ ভোটারের অভিমত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। উত্তরপ্রদেশের প্রায় ৯১ শতাংশ, উত্তরাখণ্ডের ৯০ শতাংশ এবং পঞ্জাবের ৭৯ শতাংশ ভোটার বিশ্বাস করেন সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ফলে দেশের ও প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি সারাবিশ্বে উজ্জ্বল হয়েছে। তাহলে কি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বিজেপিকে নির্বাচনে জিততে সাহায্য করবে? উত্তরপ্রদেশের ৬৭ শতাংশ এবং উত্তরাখণ্ডের ৭৬ শতাংশ ভোটার বলেছেন, করবে।

অশ্বমেধের ঘোড়ার দাপাদাপি সব থেকে বেশি উত্তরপ্রদেশে। ভারতের সর্বাপেক্ষা জনবহুল এই রাজ্যটিকে নির্বাচনী যুদ্ধের ভাগ্যবিধাতা বলা হয়ে থাকে। ২০১২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এখানে মাত্র ১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। কিন্তু ২০১৭-য় ১৬ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে ৩১ শতাংশ ভোট পাবে বলে সমীক্ষকদের অনুমান। সেই হিসেবে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৭০ থেকে ১৮৩টি আসন পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে বিজেপিকে ২০২ আসন পেতে হবে (উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার মোট আসন ৪০৩)। অর্থাৎ আরও ২০-৩০টা আসন প্রয়োজন। নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির হতে হতে এই ব্যবধান বিজেপির পক্ষে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষার ফলাফল
□ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে মতামত

স্থান	খুব ভালো	যথেষ্ট নয়	জানি না
পঞ্জাব	৮৮	৬	৬
উত্তরপ্রদেশ	৯০	৩	৭
উত্তরাখণ্ড	৭৭	৯	১৪*

সম্ভাব্য আসন সংখ্যা
গোয়া
মোট আসন—৪০

	প্রাপ্ত আসন	ভোটের হার
বিজেপি	১৭-২১	৩৮
কংগ্রেস	১৩-১৬	৩৪
আপ	১-৩	১৬
অন্যান্য	৩-৫	১২*

উত্তরপ্রদেশ
মোট আসন—৪০৩

	প্রাপ্ত আসন	ভোটের হার
বিজেপি	১৭০-১৮৩	৩১
বিএসপি	১১৫-১২৪	২৮
এসপি	৯৪-১০৩	২৫
কংগ্রেস	৮-১২	৬
অন্যান্য	২-৬	—

উত্তরাখণ্ড
মোট আসন—৭০

	প্রাপ্ত আসন	ভোটের হার
বিজেপি	৩৮-৪৩	৪৩
কংগ্রেস	২৬-৩১	৩৯
অন্যান্য	১-৪	১৮*

মণিপুর
মোট আসন—৬০

	প্রাপ্ত আসন	ভোটের হার
বিজেপি	৩১-৩৫	৪০
কংগ্রেস	১৯-২৪	৩৭
এনপিএফ	৩-৫	২৩
অন্যান্য	২-৪	১০*

* সমস্ত তথ্যই শতাংশের হারে লিপিবদ্ধ

বাতিল নোটের কড়চা

অর্থনীতিবিদ :

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতির অধ্যাপক তিনি। সেই সূত্রে অর্থনীতিবিদ। তবে এখন দিদির দলে ভিড়ে তিনি ‘তৃণমূলী অর্থনীতিবিদ’ হয়ে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ধিত ডিএ, বেতন ইত্যাদি পকেটে পুরে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ না দিয়ে দিদিকে উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল হতে সুপরামর্শ দেওয়ায় এক সময় যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল। যাই হোক, নোট বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে দিদির মনোভাবও বিলক্ষণ টের পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই সেদিন রাতেই এক জনপ্রিয় টক শো-তে হাত-পা ছুঁড়ে এমন কাণ্ড তিনি করলেন যে দেখে কে বলবে অর্থনীতিবিদ! বরং ঠিক যেন দিদিরই ভাই। ইদানীং তাঁর প্রশ্ন কেন্দ্র নোট বাতিলে এত তাড়াহুড়ো করছে কেন? কু-লোকে জানতে চায় কেন্দ্র কি ধীরেসুস্থে চোরকে পালাতে দেবে?

ফিশি ব্যাপার :

ইনিও এক অর্থনীতিবিদ বটে। তবে অনেকে বলে গ্র্যাজুয়েশনে পাশ কোর্সে ইকোনমিক্স ছিল মাত্র। তবে ইনি নিজেকে বামপন্থী অর্থনীতিজ্ঞ তথা সাংবাদিক হিসেবেই পরিচিত করাতে ভালোবাসেন। সাংবাদিকই বটে! একটি বাজারি পত্রিকায় আগে উত্তর-সম্পাদকীয়র পাতা নকশালী প্রবন্ধে ভরিয়ে দিতেন। এখন তো তিনিই সর্বেসর্বা। এনার কাজ বলতে শুধু মোদীকে গালাগাল দেওয়া। নোট বাতিলে মোদীর বাপ-বাপান্ত করার এমন মোক্ষম মওকা ছেড়ে দিলেন সম্পাদক মশাই? কেবল একটি মামুলি সম্পাদকীয় লিখেই রণে ভঙ্গ! আপনাকে খুশি করতে আপনার সাংবাদিকরা যে রবিবারে টাকার অভাবে বাঙালির পাতে মটন না পড়ায় রীতিমতো কেঁদে-কেটে আকুল। অর্থনৈতিক ব্যাপারে এই সম্পাদকমশাই অবশ্য বিস্তর জ্ঞানগর্ভ বাণী দিয়েছেন, তবে সেটা এদেশীয় নয়, মার্কিনীয় অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কিত বিষয়ে। এঁরই এক সাংবাদিক-তুতো ভাই তথা গায়ক যিনি এককালে ‘কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কদাপি নয়’ গোছের তত্ত্ব আওড়েছিলেন, তিনি ‘কাটাপোনা তত্ত্ব’ বাজারে ছেড়েছেন। লোকে আড়ালে আবডালে বলছে ফিশি ব্যাপার! ঘরে কত শত কোটি আছে সরকারমশাই, থুড়ি সম্পাদকমশাই। নাকি নকশালী অর্থনীতির ক্ষয়ক্ষতির ভয়েই কাঁটা তিনি?

দে-বাবু :

ইনি হলেন গিয়ে সরকারমশাইয়ের ডান হাত। লোকে বলে দে-বাবু। দিলে পরেই ইনি আপনার গোলাম। এককালে দিদির পেছন পেছন ঘুরতেন। আশা ছিল দিদি দেবেন। তা ক্ষমতায় এসে দিদি আর দিতে-থুতে পারলেন কই? তো দে বাবু ঘুরে গেলেন। মূলত দে বাবুর লাগাতার প্রচার সৌজন্যে সিপিএম যে দু-দশটা ভোট পেত, তাও গেল। এখন ইনি আবার দিদির পিছু নিয়েছেন। দিদি যে যে জায়গায় লোক খেপাতে গিয়েছেন এনার বশংবদ ক্যামেরাও তাকে অনুসরণ করেছে। দিদি যতটুকু পেরেছেন খেপিয়েছেন, এনার বশংবদরা বাকিটুকু করার চেষ্টা করেছেন। তবে সারদার ভবি কি চট করে ভোলে মানুষ? লোকে বলাবলি করছে চোরে চোরে না হয় মাসতুতো ভাই হয়, মাসতুতো ভাই-বোনও কি হয়? মহামহিম জনগণ গত বিধানসভা-পূর্ববর্তী এঁদের ঝগড়া-ঝাঁটি স্রেফ বখরার কারণে। তাকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয়।

সড়া অন্ধা :

গোপাল ভাঁড় এই পদ্ধতিতে জনগণ কোন ভাষাভাষী সেটা আবিষ্কার করেছিলেন। আমরা আবিষ্কার করলাম দিদিকে। নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত না হলে আমরা জানতেই পারতাম না যে দিদি পুজো দেন। তাও আবার মোটে একশো টাকার। তা সেই মিষ্টিটুকুও তাঁকে ধারে কিনতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর খাতিরে কেউ ফ্রি-তে দেয় না। বলা ভালো, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নেন না। সত্যিই কী নীতিনিষ্ঠ! লোকে বলাবলি করছে তাঁর ভাইয়েরা (রাজনৈতিক ও নিজস্ব) এমন কর্ম করলে পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টির দোকানের মালিকদের অজস্র আশীর্বাদ তিনি পেতেন। যাই হোক, মুদিখানা কিংবা বাজারে লোক যে তাঁর পরিবারকে ধারেও জিনিস দেয় না এটা বেশ অভিনব। যেখানে প্রায় প্রতিটি রাজ্যবাসী ক'দিন মুদীখানা থেকে বা বাজারে ধারে জিনিস নিয়েছে, সেখানে দিদির পরিবার কোনো ধার পায়নি। অগত্যা একশো টাকার নোটের অভাবে মুড়ি-আলুভাজা খেয়েই নবান্নে ছুটতে হয়েছে তাঁকে। সত্যিই সড়া অন্ধা ব্যাপার!

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর
‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

কালমাদির নিয়োগে মনমোহনের হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমস সংগঠন কমিটির চেয়ারম্যান পদে সুরেশ কালমাদির নিয়োগে সবুজসঙ্কেত দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্বয়ং। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গেমস সংগঠনে চূড়ান্ত দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছিল সুরেশ কালমাদির বিরুদ্ধে। সরকারি সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, একটি অফিস মেমোরেন্ডাম থেকে জানা গেছে ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের

সুরেশ কালমাদি

একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে নোট দিয়ে সুরেশ কালমাদিকে কমনওয়েলথ গেমস সংগঠন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

মেমরেন্ডাম থেকে আরও জানা গেছে, কালমাদির কাজের প্রকৃতিও ঠিক করে দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর অফিস। আপাতত পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি মেমরেন্ডামটি পরীক্ষা করে দেখছেন। কালমাদির নিয়োগের পিছনে আর কী শর্ত ছিল কমিটি জানতে চাইতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কালমাদির নিয়োগ এবং গেমস সংগঠনে ব্যর্থতা দেশ জুড়ে সমালোচিত হয়েছিল। এটাই ছিল ইউপিএ-২ সরকারের প্রথম বড়ো কেলেঙ্কারি।

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com

9830372090

9748978406

ঠাকুর ঘরে কে রে? দিদি তো কলা খাননি...

নরেন্দ্র মোদী নতুন করে লাইনে দাঁড় করিয়েছেন দেশপ্রেমী, সৎ নাগরিকদের। তাতে কারও কারও আপত্তি রয়েছে। আমরা ঠাকুর দেখার জন্য লাইন দিই, জিও সিম নেওয়ার জন্য লাইন দিই, ট্রেনের টিকিট, খাসির মাংস এমনকি মদের দোকানেও লাইন দিই। কোনো দিদি বা দাদা তাতে আপত্তি করেন না। কিন্তু এই বারে কেন করছেন? তাহলে কি কলা খাওয়ার সেই গল্পটা রয়েছে!

পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের পর থেকেই সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গেল গেল রব তুলেছেন তিনি। কিন্তু কেন এমন করছেন! দেশের অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা তো এতটা সরব নয়! কালো টাকা বাতিলের সিদ্ধান্তে কি ভয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস? কীসের ভয়!

নরেন্দ্র মোদী পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদে নেমে পড়েন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! মোদীর সিদ্ধান্তকে তুঘলকি বলে তিনি বলেন, 'আর এক সেকেন্ডও ক্ষমতায় থাকা উচিত নয় এই সরকারের। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখতে গিয়ে জানিয়েছেন, খুচরো টাকার অভাবে তিনি নাকি পুজো দেওয়ার মিষ্টিটুকুও কিনতে পারছেন না। মুখে না বলেও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাছে সব বড় বড় নোট। ছোট নোটের কারবার নেই। বাংলার যে সাধারণ মানুষের ভোটে তিনি বিশাল শক্তি নিয়ে ক্ষমতায় সেই জনতাই দিদির সমালোচনা করতে কসুর করেনি। শুধু সমালোচনা নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের তথা তৃণমূলনেত্রীর ভয় নিয়ে নানা বিরূপ মন্তব্যেও ভরে গিয়েছে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ।

উল্টো দিকে প্রচুর মানুষ একটি বার্তা শেয়ার, পোস্ট, ফরোয়ার্ড করেছেন। 'নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন দু'হাত তুলে করছি। ভোটের দিকে না তাকিয়ে, পার্টি-ফান্ডের দিকে না তাকিয়ে যে তেতো ওষুধ তিনি গেলালেন আজ, ভারতের রাজনীতির ইতিহাস তাকে মনে রাখবে।'

এই বার্তাটির বহুল প্রচার বুঝিয়ে দিয়েছে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ করা বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত। সেটা বুঝেই সম্ভবত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে নিয়মিত ফেসবুক করলেও এই সংক্রান্ত কোনো পোস্ট করেননি। করলে সেখানে প্রতিবাদ ও সমালোচনা আছড়ে পড়ত। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় জনপ্রিয় নয় 'টুইটার'কে বেছে নিয়েছেন। আর তাতেও যে খুব সাড়া পেয়েছেন তা নয়। অরবিন্দ কেজরীবাল ছাড়া মমতার ট্যুইটটি আর কেউ রিট্যুইটও করেননি।

তৃণমূল কি ভয় পেয়েছে? দিদির দল সম্পর্কে এমন প্রশ্ন আমি অন্তত করতে পারব না। তবে এই প্রশ্ন নিজেই যেন তুলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিবাদের জবাব দিতেই নানা উত্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে। কেউ তুলেছেন সারদা কেলেঙ্কারির কালো টাকার কথা, কেউ তুলে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি বিক্রির পুরনো প্রসঙ্গ। আবার অনেকেরই বক্তব্য, তৃণমূল দলটাই চলে কালো টাকায়, টেট থেকে সিন্ডিকেট সর্বত্র হয়েছে কোটি কোটি টাকার নগদ লেনদেন। এখন সেই কালো টাকা আচমকাই বাতিল কাগজ হয়ে যেতে বসায় এতটা সরব তৃণমূলনেত্রী। রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলতে কম যাচ্ছে না রাজনৈতিক দলগুলিও।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে এই প্রতিবাদ মানায় না! ওঁর দলের নেতা-মন্ত্রীরা মুঠো মুঠো কালো টাকা আত্মসাৎ করেছেন, তা জেনেও তাঁদের পদে বহাল রেখেছেন তিনি।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, 'মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তৃণমূল নেত্রীর। তিনি রাতে ঘুমোতে পারেননি। সারদা-সহ বিভিন্ন অর্থলগ্নি সংস্থার কোটি কোটি বেআইনি টাকা তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা কোথায় সরাবেন, তা ভেবে ঠিক করতে পারছেন না।'

আর রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের ছোট্ট জবাব, 'চিট ফান্ডের টাকা লুঠ করে যাঁরা দল চালাচ্ছেন তাঁদের তো অসুবিধা হবেই! কালীঘাটের টালির চালের ঘরে আর তৃণমূল ভবনে কত কালো টাকা রয়েছে যে দিদি এত চিন্তিত?'

দিদি এতটাই চিন্তিত যে চিরশত্রু সিপিএম সঙ্গে থাকলেও নোট বাতিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলন করতে তাঁর আপত্তি নেই। নিজেই সেটা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আবেদনে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সিপিএম-তৃণমূলের জোটবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে নানারকম ব্যঙ্গ, বিদ্রুপও শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যাশিতভাবেই মমতার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। শুধু প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়াই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলকে কালো টাকা এবং দুর্নীতি ইস্যুতে তীব্র কটাক্ষ করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক।

যাঁরা ভাবছেন দিদি বেকায়দায় তাঁরা ভুল ভাবছেন। কালোকে সাদা করাটা দিদির কাছে সামান্য ব্যাপার। এর পরে দিদি বলে দেবেন, 'কালো টাকা! গোটাটাই সাজানো ব্যাপার।'

সকলকে বিনীত অনুরোধ— দিদির পাশে থাকুন।

—**সুন্দর মৌলিক**

ঘরে বস্তাবন্দি অচল টাকা, রাগ তো হবেই

দুটি ঘটনা এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। আমেরিকার ভোট এবং ভারতের বাতিল নোট। এই দুটি ঘটনার পক্ষে ও বিপক্ষে চলছে তুমুল বিতর্ক। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্প জেতায় মুসলমান তোষণকারী ভারতীয় বুদ্ধিজীবী কলমচিরা বেজায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের বক্তব্য আমেরিকায় বসবাসকারী সমস্ত মুসলমানই সন্ত্রাসবাদী নয়। কিন্তু ট্রাম্পের মুসলমান বিদ্বেষী নীতি তাদের আই এস বা আল কায়দার খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য করবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার তা মনে হয় না। কারণ নির্বাচিত হওয়ার পর ট্রাম্প এমন কোনো কথা বলেননি যাতে মনে হতে পারে তিনি ঘোরতর মুসলমান বিরোধী। আমেরিকার শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভোটদাতারা অনেক ভাবনাচিন্তা করেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্বাচিত করেছেন। তাই ভারতে বসে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মায়াকান্না না কাঁদলেই ভাল করবেন। আমেরিকার ভালমন্দের ব্যাপারটা সেখানকার নাগরিকদেরই ভাবতে দিন।

বরং ভারতে নোট বাতিলের বিতর্কটি বেশি প্রাসঙ্গিক। কেন্দ্র এতকাল চালু থাকা ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করায় নিঃসন্দেহে প্রথম সাতদিন সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়েছেন। কিন্তু একটা কথা মমতা, মুলায়ম, লালু ছাড়া দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ বুঝেছেন যে কালো টাকা এবং পাকিস্তান থেকে পাচার করা জাল টাকা রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। মুলায়ম, মায়াবতী, লালু নোট বাতিলের বিপক্ষে কারণ তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরা উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার নির্বাচনে লড়তে বিপুল পরিমাণে কালো টাকা বস্তাবন্দি করে ঘরে রেখেছিলেন। বিহার উত্তরপ্রদেশে টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনা হয় সে কথা সবাই জানে। শিল্পপতিদের পরেই সব থেকে বেশি কালো টাকার মজুতদার ছোট বড় আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি। এরা শিল্পপতিদের কাছ থেকে ডোনেশন বা সাহায্য বাবদ বিপুল কালো টাকা উপহার পায়। কোনো আঞ্চলিক দলই তার দলীয় তহবিলের টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট দশ শতাংশের বেশি

গূঢ় পুরুষের কলম

রাখে না। বস্তায় ভরে ঘরে রাখে। মুলায়মের সাজানো সংসারে আগুন লেগেছে এই কালো টাকার বখরা নিয়ে। নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে যে কয়েক শত কোটি টাকা পকেটে আসতো তাই নিয়ে কাকা ভাইপোর কাজিয়া চলছে। সেই কাজিয়ায় আর লাভ নেই। কারণ দলের টিকিট পেতে প্রার্থীরা চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে ঘুষ দেবে না। একই করুণ অবস্থা মায়াবতীর। তাঁরও দলের টিকিট বিক্রির ব্যবসা বন্ধ। রাগ তো হবারই কথা।

সারদা ও নারদ কাণ্ডের পর বাংলার মানুষ আর বিশ্বাস করেন না যে তৃণমূল কংগ্রেস সৎ ও স্বচ্ছ দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেতন নেন না। অথবা প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে প্রাপ্য পেনশন নেন না। তাঁর ঘর সারানোর খরচ তিনি নিজে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। প্রায়ই খবরের কাগজে পড়ি গরিব সাক্ষাৎপ্রার্থী সাহায্য চাইলে পঞ্চাশ হাজার সত্তর হাজার টাকা ক্যাশ ব্যাগ থেকে বার করে দান করেন। খবরগুলি কতটা সত্য তা নিয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। কারণ, বাছাই করা কিছু সিনিয়ার সাংবাদিক এখন মুখ্যমন্ত্রীর ইমেজ বিল্ডিংয়ের কাজ করছেন। বিনিময়ে তাঁরা লয়্যালটি বোনাস পেয়ে থাকেন। তবে যদি ধরে নিই যে খবরের কিছুটা সত্যি তবে প্রশ্ন উঠবেই যে নগদ টাকা তাঁর কাছে আসে কীভাবে। যিনি বেতন নেন না, পেনশন নেন না তিনি চন্দননগরে গিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোয় সন্দেশ কিনতে ব্যাগ থেকে পাঁচশো টাকার নোট বার করেন কী করে? সন্দেশের দোকানি অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধারেই সন্দেশ দিয়েছেন। হ্যাঁ, নোট খারিজ হওয়ায় রাজনীতিকদের অনেকেই বিপাকে পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মমতা নোট বাতিল বিতর্কে সুর চড়িয়েছেন কারণ এই সুযোগে বিজেপি বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলিকে তাঁর স্বপ্নের ফেডারেল ফ্রন্টে টেনে আনা সহজ হবে বলে। মমতা এখন সিপিএমকে আর অচ্ছুৎ মনে করছেন না। বলছেন, নোট বাতিল বিতর্কে সংসদে তৃণমূল এবং সিপিএম এক জোট হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করবে। তৃণমূল- সিপিএম ভাই ভাই বঙ্গবাসী এবার সেটাই দেখবে। মমতা যে জাতীয় রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা নিতে চাইছেন তা তাঁর সাম্প্রতিককালে হিন্দি ভাষা শিক্ষার তালিম নেওয়া থেকে স্পষ্ট। নবান্নে বাঙালি সাংবাদিকরা বাংলায় প্রশ্ন করলেও তিনি হিন্দিতে উত্তর দিচ্ছেন। হিন্দি দেশের রাষ্ট্রভাষা। তাই হিন্দি ভাষা শিক্ষায় আপত্তির কিছু নেই। তবে মোদীজীকে 'গন্দা আদমি' বলতে গিয়ে 'গন্ধা আদমি' বললে যে হিন্দি ভাষার পিণ্ডি চটকে দেওয়া হয়, সে কথা তাঁর পোষা সাংবাদিকদের বলবে কে?

এত বছর সরকার চালিয়েও তিনি গভর্নমেন্টকে 'গরমেন্ট' বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। সংস্কৃতিকে 'সমস্কৃতি' বলে চলেছেন অবাধে। এবার হিন্দি ভাষার উপর স্টিম রোলার চালালে তাঁর সাধের ফেডারেল ফ্রন্ট চলবে তো?

চীন ও পাকিস্তানে প্রকৃত গণতন্ত্রই আঞ্চলিক শান্তির চাবিকাঠি

সুব্রত ভৌমিক

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় সত্তর বছরেও ভারত কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ। সংসদে পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখলের এক নিরামিষ প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারত বৃহৎ শক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। প্রতিবেশী লাল চীন (যাকে ভারত সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়) উচিত বা অনুচিত হোক নিজ ক্ষমতাবলে তিব্বত দখল করেছে ও চিরশান্তির দেশ ভারতের বেশ কিছুটা জমি দখল করে রেখেছে। চীন এমনই এক দায়িত্বশীল, ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় দেশ যে দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের রায়ও অমান্য করবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। অথচ সেই চীনও নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। তার ভেটো প্রয়োগের ফলে ভারত এন এস জি গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারেনি, এমনকী আজহার মাসুদকেও জঙ্গি ঘোষণা আটকে গিয়েছে। কীভাবে এই আঞ্চলিক অশান্তি দূরীভূত হতে পারে এ ব্যাপারে আবেগপূর্ণের পরিবর্তে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

পাকিস্তান ও চীনের আগ্রাসনকে সামনে রেখে বৃহৎ শক্তিগুলি ভারতকে ব্ল্যাকমেইল করে অস্ত্র বিক্রি ও শুধু নিজেদের স্বার্থ রক্ষিত হয় এরকম একপক্ষীয় শর্তে বাণিজ্য করে আসছে। এব্যাপারে তাদের দ্বিচারিতা লক্ষণীয়।

একদিকে তারা ইরান বা ইরাকের পরমাণু শক্তিধর হয়ে ওঠার ঘোরতর বিরোধী। কারণ, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ ইরান ও ইরাকের পক্ষে যথাক্রমে শিয়াপন্থী ও সুন্নিপন্থী মুসলমান দেশগুলির নেতৃত্ব করে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদের উপর একাধিপত্য জমিয়ে বৃহৎ শক্তিগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব যার ফলে তারা তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। এবং সেই কৌলিন্য ও ইচ্ছা এই দুটি দেশের রয়েছে যা বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু দারিদ্র্য জর্জর পাকিস্তানের না আছে সেই সামর্থ্য ও কৌলিন্য। প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তানকে মুসলমান-বিশ্ব দার-উল-ইসলাম মনেই করে না। কাজেই পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর হয়ে শান্তিপ্রিয় ভারতকে ক্রমাগত জ্বালাতন করে গেলে বৃহৎ শক্তিগুলির কোনো অসুবিধা নেই বরং সুবিধা। কারণ, পাকিস্তান জুজু দেখিয়ে ভারতকে দোহন করা যাবে। সাম্প্রতিক আর্থিক বিকাশ দেখে ও অগ্নি-পৃথ্বী মিসাইলের কথা শুনে ভারতবাসী খুবই উৎসাহিত বোধ করছে যে এবার বুঝি ভারত কিছু একটা করবে। কিন্তু ভারত আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে পাকিস্তানের তুলনায় কত বেশি শক্তিশালী, গুগল সার্চ করা সেই তথ্যের ভিত্তিতে না করে যদি আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করি তবে হতাশাই জাগবে। কারণ—

(১) ইতিপূর্বে তিনবার প্রথাগত যুদ্ধে জিতেও ভারত বৃহৎ শক্তিগুলির মাতব্বরি অমান্য করার মতো যথেষ্ট স্বাবলম্বী না হওয়ায় কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে পারেনি।

(২) এখন যদিও স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে এগোচ্ছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে পরমাণু শক্তিধর করে তোলা হয়েছে। এটা হওয়ার আগেই যদি ভারত কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে অথবা ইজরায়েলের মতো যেভাবেই হোক পাকিস্তানের পরমাণু শক্তিধর হওয়া আটকাতে পারতো তবে ব্যাপারটা অন্যরকম হোত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত ভারতের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। কারণ পাকিস্তান

> “কোনো মুসলমান দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র ও পরমত সহিষ্ণুতা নেই। আর পাকিস্তান তো জন্মলগ্ন থেকেই জেহাদি উন্মাদ মোল্লা-মৌলবি ও সেনানায়কদের দ্বারা পরিচালিত যারা দেশবাসীকে ভারতের ভয় দেখিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে। সেখানকার সাধারণ নাগরিকরা বঞ্চিত, দরিদ্র এবং ভারত বিরোধিতায় তাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই।”

এখন মোল্লা-মৌলবি ও সেনানায়কদের খপ্পরে যারা মহাভারতের যুদ্ধের শেষপর্বে অশ্বত্থামার মতো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

(৩) দ্বিমেরু বিশ্বের চালচিত্র পাল্টে গিয়েছে। পাকিস্তানের পাশে এখন নতুন বন্ধু চীন। চীনের ভরসায় বলীয়ান হয়ে পাকিস্তান এখন পুরনো অভিভাবক আমেরিকাকেও গুরুত্ব দিতে নারাজ। চীনও অরুণাচলকে বিতর্কিত অঞ্চল বলে, বারবার সীমান্ত অতিক্রমণ করে তার ভারত-বৈরী মানসিকতায় ধার দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ ভারত বর্তমানে দুটি পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী দ্বারা পরিবেষ্টিত যারা সুযোগ পেলেই ছোবল মারতে উদ্যত।

(৪) ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের দিক থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য ভবিষ্যতে চীন যে ভারতকে সমস্যায় ফেলতে পারে তা তৎকালীন বা পরবর্তী রাষ্ট্রনায়করা অনুধাবনই করতে পারেনি যার মাশুল আজ গুনতে হচ্ছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গোয়াদর বন্দর পর্যন্ত করিডর তৈরির ফলে চীন ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক দিক থেকে প্রভূত লাভবান হবে এবং প্রয়োজনে সামরিক সম্ভার দ্বারা ভারতকে পশ্চিম দিক থেকেও ঘিরে ফেলতে পারবে। এই লাভের জন্য পাকিস্তানের সমস্ত কুকীর্তির প্রতি তারা চোখ বুঁজে রয়েছে। পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর হওয়ার আগেই ভারত যদি অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখল করতো তবে 'না রহতা বাঁশ না রহতা বাঁশরি' অর্থাৎ আজ এই সমস্যা উদ্ভবই হোত না।

(৫) শুধুমাত্র অস্ত্রের দাপটে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের মতো আমেরিকাকে হুমকি দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা শোভা দেয় না। কারণ পাকিস্তান, চীন বা উত্তর কোরিয়ার মতো দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র না থাকায় সে দেশের শাসকের মতো নিজের দেশের নাগরিকদেরই শোষণ ও বঞ্চিত করে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান তথা সার্বিক জনকল্যাণকে অবহেলা করে সামাজিক খাতে ব্যয় বাড়িয়ে যাওয়া ভারতের মতো সংবেদনশীল গণতন্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারত সরকার যেটুকু ব্যয় করে তা নেহাতই আত্মরক্ষার জন্য, কোনো আগ্রাসন দেখানোর জন্য নয়। কিন্তু প্রতেবেশীরা যত বেশি আগ্রাসন দেখাবে ভারতকে তত বেশি ব্যয় করতে হবে। এর শেষ কোথায় তা কেউ জানে না।

এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য ভারতকে অবশ্যই প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং তার কিছু নমুনা ইতিমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে। আমি অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যা ভারতের ইচ্ছা বা সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যার পিছনে মূল কারণ হলো ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ও চীনের শাসককুলের প্রকৃতিগত পার্থক্য। আবহমানকাল ধরে (ইসলাম ও ব্রিটিশ এই দুই বিজাতীয় শাসনকাল এবং দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে) ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় শাসককুল প্রকৃতিগত ভাবে সহনশীল, উদার, 'জিও অউর জিনে দো'— অর্থাৎ পারস্পরিক সহাবস্থানে বিশ্বাসী।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে বিশ্বের প্রায় কোনো মুসলমান দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র ও পরমত সহিষ্ণুতা নেই। আর পাকিস্তান তো জন্মলগ্ন থেকেই জেহাদি উন্মাদ মোল্লা-মৌলবি ও সেনানায়কদের দ্বারা পরিচালিত যারা দেশবাসীকে ভারতের ভয় দেখিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে। সেখানকার সাধারণ নাগরিকরা বঞ্চিত, দরিদ্র এবং ভারত বিরোধিতায় তাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই। 'নাম কা ওয়াস্তে' নির্বাচিত সরকার থাকে যার কর্ণধাররা অধিকাংশই মধ্যযুগীয় সামন্ত যারা সেনাবাহিনীর হাত থেকে নিজের গদি বাঁচানোর জন্য তাদের প্রভুর ভারত বিরোধিতার চড়া সুরে সুর মেলায়।

চীনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। চীনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্ক সেই ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, অতীশ দীপঙ্কর— নালন্দার সময় থেকেই। আজও তারা রফি, মুকেশের গানের ভক্ত। ভারতবাসী স্বপ্নেও কখনও চীনা গান শুনেছে কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা এখনও ভারতের প্রভাব স্বীকার করে ও মনেপ্রাণে তারা অধিকাংশই ভারত বিরোধী নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চীনে একনায়কতন্ত্রী, অগণতান্ত্রিক, কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় থাকায় সে দেশের বিদেশনীতিতে সাধারণ চীনবাসীর এই ভারত প্রীতির কোনো প্রতিফলন নেই। চীনা কমিউনিস্ট শাসকরা বিশ্বজুড়ে নিজেদের রাজনৈতিক দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চায়। তাই তারা নিজেদের দেশে যেমন অন্য কোনো রাজনৈতিক চিন্তাধারা (গণতন্ত্র) বিকশিত হওয়ার ঘোরতর বিরোধী, তেমনই আয়তনে চীনের প্রায় এক তৃতীয়াংশেরও কম ও জনসংখ্যায় প্রায় নব্বই শতাংশের সমতুল্য ভারত গণতন্ত্র, সহনশীলতা ও শান্তির পথে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে চীনকেও ছাপিয়ে যাক এবং বিশ্বশক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা পাক এটা চীনা কমিউনিস্ট শাসকদের পছন্দ। কারণ, সেক্ষেত্রে মাওবাদী চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে ও সাধারণ চীনবাসীর মনে দীর্ঘদিনের অবদমিত গণতন্ত্রের আগুন জ্বলে উঠবে। ইতিপূর্বে একবার ট্যাঙ্ক চালিয়ে কয়েক হাজার ছাত্রকে পিষে ফেলে গণতন্ত্রের দাবিকে ধামাচাপা দেওয়া গেলেও আবার তা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, চীনের মানুষ বাজার অর্থনীতির হাত ধরে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। আর বিচক্ষণরা জানেন যে সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনের ক্রমপর্যায় হলো--- রাজতন্ত্র/সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র। চীনা কমিউনিস্টদের লক্ষ্যই হলো ছলে-বলে-কৌশলে ভারতকে বিব্রত করে তার আর্থিক উন্নতি ব্যাহত করা এবং বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিক মহলকে দেখানো যে ভারত আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে চীনের চেয়ে কত নিকৃষ্ট, যাতে তারা তৃতীয় বিশ্বে ছড়ি ঘোরাতে পারে। শুধু ভারতকে এই হীন প্রতিপন্ন করার জন্যই এবং পাশ্চাত্যের চোখের মণি ও তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানে মাওয়ের প্রধান প্রতিপক্ষ নেহরুর মুখে ঝামা ঘষে দেওয়ার জন্যই চীন ভারত আক্রমণ করেছিল। এবং সেই

ট্র্যাডিশন এখনও চলছে। ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদ, এন এস জি-র সদস্য হতে না দিয়ে; অরুণাচলকে নিজের অংশ বা বিতর্কিত অঞ্চল বলে দাবি করে; একতরফা ভাবে সীমান্ত অতিক্রমণের মাধ্যমে; এমনকী আজহার মাসুদকে জঙ্গি ঘোষণা করতে না দিয়ে চীন এটাই বোঝাতে চাইছে যে সে এখন সুপার পাওয়ার আমেরিকা, রাশিয়ার সমগোত্রীয় এবং পাকিস্তান ও ভারত তৃতীয় বিশ্বের দুটি সমমর্যাদা- সম্পন্ন দেশ। তাই ভারতকে সদস্য করতে হলে পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তানকেও করতে হয় এরকমই তাদের বক্তব্য।

অর্থাৎ পাকিস্তানকে সামলাতে হলে ভারতকে আমেরিকা, রাশিয়া নয় বরং চীনের দ্বারস্থ হতে হবে এরকমই তাদের হাবভাব। (এই বিশ্লেষণ ভারত, পাকিস্তান ও চীন সাপেক্ষে। এর অর্থ এই নয়, যে আমেরিকা, রাশিয়া গণতান্ত্রিক হওয়ায় তারা সাম্রাজ্যবাদী নয়।)

এ ব্যাপারে বাংলাদেশের উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ভারতের বদান্যতায় বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও মুজিব হত্যার পর সেখানে সেনা শাসন শুরু হয় এবং তখন থেকেই সেখানে ভারত বৈরিতারও প্রকোপ শুরু হয়। অনেক বছরের অস্থিরতার পর সেখানে বিগত কয়েক বছর ধরে আবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে (যদিও এক্ষেত্রে ভারতেরও ভূমিকা রয়েছে) এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভারত বৈরিতাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। সেখানকার টি ভি চ্যানেলগুলিতে অহরহ ভারতীয় বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের গান শোনা যায়, শারদীয়া উপলক্ষে তিন-চার দিন ধরে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় যা এক সময় ছিল অকল্পনীয়। অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতি সেখানে জনপ্রিয় যা দুই দেশের মানুষকে কাছে টানে। (যদিও এই সুস্থ পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য মৌলবাদী ও জঙ্গিরা মন্দির ও মূর্তি ভাঙা, পুরোহিত হত্যার মতো বিষাক্ত কাজ করে চলেছে।) কিন্তু সার্বিকভাবে ভারত বৈরিতার হ্রাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশের যে একটা ভূমিকা রয়েছে উপরোক্ত উদাহরণ তারই প্রমাণ।

উপরোক্ত উদাহরণের মধ্যেই আশার আলো লুকিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ পাকিস্তানেও যদি সাধারণ মুসলমানরা বুঝতে পারে যে ভারত বৈরিতার নামে তাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা হয়েছে এবং সেনানায়ক ও মোল্লাতন্ত্র আকণ্ঠ ভোগে ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত আর স্বাধীনতার এত বছর পরেও তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে তবে তাদের মনে পূর্বোক্তদের প্রতি ক্ষোভ বাড়বে। তারা যদি এটা দেখেও অনুপ্রাণিত হয় যে ভারতের মুসলমানরা তাদের থেকেও বেশি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে; পাকিস্তানি মুসলমানদের তুলনায় অধিক বাক্‌স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ভোগ করে তবে তাদের মনে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগতে পারে। ইতিমধ্যেই অবশ্য বালুচিস্তান-সহ পাক-অধিকৃত কাশ্মীরেই মোল্লা-মৌলবি, জঙ্গি ও সেনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দাবি গর্জে উঠেছে এবং এই দাবি নিয়ে যদি সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে সেরকম কোনো নেতৃত্ব উঠে এসে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে এই প্রতিবেদকের দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলাদেশের মতো পাকিস্তানেও ভারত বৈরিতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। ইতিপূর্বে বাজপেয়ীজী ও বর্তমানে মোদীজী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে নিরন্তর বার্তালাপের মাধ্যমে পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ও ভারতের সহযোগিতায় যেভাবে মোল্লাতন্ত্র, জঙ্গি ও সেনার দুষ্টচক্র ধ্বংস করতে পেরেছেন শরিফ কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তা করতে ব্যর্থ। একবার ভারতের সঙ্গে স্থায়ী সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করলে মুশারফ কার্গিল যুদ্ধের মাধ্যমে তা ভেস্তে দেয়। অতএব পরবর্তী অন্য কারও অপেক্ষায় আমাদের থাকতে হবে।

চীনবাসীও যদি এই দেখে অনুপ্রাণিত হয় যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাক্‌স্বাধীনতা ও মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়েও ভারতের মতো একটি বৈচিত্রপূর্ণ দেশ প্রকৃত ও সুষম আর্থিক বিকাশ (সাংহাই কেন্দ্রিক বা ওই জাতীয় লোক দেখানো আর্থিক বিকাশ নয়) সম্ভব করেছে তবে তাদের মনেও গণতন্ত্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বাড়বে এবং যে-কোনো মূল্যে তারা গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য মরিয়া চেষ্টা করলে চীনে কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রের পতন হতে পারে। সেক্ষেত্রেও সরকারি স্তরে চীনের ভারত বিরোধিতা অনেকাংশে কমবে বলে মনে হয়। এজন্য হয়তো তাদের আরও একবার তিয়েন-আন-স্কোয়ারের মতো মূল্য চোকাতে হবে। অবশ্য বিশ্বে কোন অধিকারই বা মূল্য ছাড়া অর্জিত হয়েছে! তাই সেই আশাতেই রইলাম।

এই সম্পূর্ণ প্রকরণে ভারতের ভূমিকা শুধু এই যে— ভারতে অনেকক্ষেত্রেই গণতন্ত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ভারত যদি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে পাকিস্তান ও চীন-সহ বাকি বিশ্বকে চমকে দিতে পারে তবেই সেদেশের মানুষ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ ব্যাপারে জাপানের উদাহরণ আমাদের কাছে আদর্শ হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর সামরিক দিক থেকে জাপানের হাত-পা বাঁধা হয়ে গেলেও তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাণিজ্যিক প্রয়োগে ব্যাপক উন্নতি ঘটিয়ে বিশ্বে দ্বিতীয় বা তৃতীয় আর্থিক শক্তিরূপে সকলের সমীহ আদায় করে নিয়েছে। আমার মনে হয় না ভারতের পক্ষে কাজটা একান্তই অসম্ভব। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। শুধু মানবসম্পদের একটা ভালমতন অংশকে গুণমানে জাপানিদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে হবে। তাই মনে হয় গণতান্ত্রিক ভারতের সমৃদ্ধির ছটায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিবেশী পাকিস্তান ও চীনবাসীর নিজ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আঞ্চলিক শান্তির চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে।

(লেখক ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অব ইন্ডিয়ার অ্যাসোশিয়েট সদস্য)

সন্দীপ চক্রবর্তী

পাকিস্তানকে ম্লেচ্ছদেশ বললে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্ধ প্রবক্তারা নাক সিঁটকোবেন। সবিনয়ে তাদের জানিয়ে রাখা ভালো, 'ম্লেচ্ছ' শব্দের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রাচীন ভারতে 'ম্লেচ্ছ' অর্থে অসভ্য বা বর্বরদের বোঝানো হোত। যে দেশের আশ্রিত জঙ্গিরা মধ্যরাতে ব্যারাকে ঢুকে ঘুমন্ত সৈন্যদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে কিংবা অযোধ্যার বাবরি ধাঁচার মতো সম্পূর্ণ অবৈধ একটি নির্মাণ ভেঙে ফেলার প্রতিক্রিয়ায় যে দেশের তিন শতাধিক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়, সেই দেশকে অসভ্য বা বর্বর বলতে কারও আপত্তি থাকা উচিত নয়।

পাকিস্তানের শাসকবর্গ নানা সময়ে সেদেশের হিন্দু দেবালয়, মন্দির মঠ ও আশ্রম ধ্বংস করার ব্যাপারে পর্যাপ্ত ইন্ধন জুগিয়েছে। মারাত্মক অস্তিত্বের সংকটে ভুগলেও কয়েকটি মন্দির এখনও টিকে আছে। এই নিবন্ধে তার মধ্যে কিছু বিখ্যাত মন্দিরের পৌরাণিক- ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

পাকিস্তানের বিলুপ্তপ্রায় হিন্দুমন্দির

হিংলাজ মাতার মন্দির :

হিঙ্গুলা থেকে হিংলাজ কথাটির উৎপত্তি। করাচি থেকে ২৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গেলে হিঙ্গুলা নদীর দেখা পাওয়া যাবে। লিয়ারি তহশিল পার্বত্য অঞ্চল কাছেই। হিঙ্গুলা নদীর পশ্চিমদিকে মাকরান মরুভূমির অন্তর্গত খিরথার পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে হিংলাজ মাতার মন্দির। মন্দিরটি আদতে একটি পার্বত্য গুহা। মানুষের তৈরি কোনো বিগ্রহও নেই। একটি প্রস্তরখণ্ড যুগ যুগ ধরে হিংলাজ মাতা রূপে পূজিত হয়ে আসছে। সিঁদুর মাখানো প্রস্তরখণ্ডটি দেখলে সম্ভ্রম জাগে। শতসহস্র বিপদ তুচ্ছ করে হিন্দু তীর্থযাত্রীর ঢল পাকিস্তানের প্রত্যন্ত এই বালুচিস্তান প্রদেশে কবে থেকে নামছে কে জানে!

হিংলাজ মাতার মন্দির একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম। কথিত আছে, সতীর ব্রহ্মতালু এখানে পড়েছিল। শক্তিপীঠের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন তন্ত্রের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, হিংলাজ মাতাকে সকলেই উচ্চাসন দিয়েছে। কুলার্ণব তন্ত্র মতে ১৮টি শক্তিপীঠের মধ্যে গুরুত্বের বিচারে হিংলাজ মাতা রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। কুব্জিকা তন্ত্রের ৪২টি শক্তি বা সিদ্ধপীঠের মধ্যে হিংলাজ মাতার স্থান পঞ্চম। তন্ত্রচূড়ামণির মঠ নির্ণয় ও মহাপীঠনির্ণয় অধ্যায়ে প্রথমে ৪৩টি পীঠস্থান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরে আরও ৮টি পীঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রচলিত তন্ত্রগুলির মধ্যে তন্ত্রচূড়ামণির স্থান সর্বাগ্রে। এই তন্ত্রে প্রত্যেক শক্তিপীঠের দেবী ও ভৈরবের (শক্তিপীঠের রক্ষক শিব) নাম এবং অঙ্গপ্রতঙ্গের (সতীর দেহাংশ ও অলঙ্কারাদি) কথা পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মস্তিষ্ক মানবশরীরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। মস্তিষ্কের উপরিতলকে বলে ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মতালু। সতীর ব্রহ্মতালু এখানে পড়ায় তন্ত্রচূড়ামণির মতে একান্নপীঠের মধ্যে হিঙ্গুলা (মতান্তরে হিঙ্গুলতা) বা হিংলাজ তীর্থই সর্বশ্রেষ্ঠ। হিংলাজ ছাড়াও দেবী এখানে কোট্টারি, কোট্টারিষা এবং কোট্টাভি নামে পরিচিতা। ভৈরবের নাম ভীমলোচন। শিবসরিৎ তন্ত্রেও ৫১ পীঠের মধ্যে হিংলাজ পীঠকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। ষোড়শ শতকের বাঙালি কবি মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে ৯টি

টিলা যোগিয়াঁ।

শক্তিপীঠের কথা লিখেছেন সেখানে তিনি সবার শেষে হিংলাজ মাতার নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন এখানে সতীর নাভিদেশ পড়েছিল।

প্রাতিষ্ঠানিক দূরত্ব অতিক্রম করে হিন্দু দেবদেবীরা দৈনন্দিন জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে ওঠেন, এমন প্রমাণ প্রচুর আছে। এটা খ্রিস্টান ধর্মের পাপ ও পাপী কিংবা ইসলামের বান্দা-পরওয়ারদিগর সম্বন্ধের সঙ্গে ঠিক মিলবে না। দেবী এখানে মা। ভক্তসন্তানের পালক-পোষক ও রক্ষক। এই ভাবনা ঘিরে গড়ে উঠেছে অজস্র কিংবদন্তী। দু-একটা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ত্রেতাযুগে দুই রাজা ছিল। নাম হিঙ্গোল আর সুন্দর। দু'জনেই ভয়ানক অত্যাচারী। প্রজাদের অবস্থা খুবই করুণ। তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে গণেশ সুন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু সুন্দরের মৃত্যুর পর হিঙ্গোল আরও উন্মত্ত হয়ে উঠল। এবার প্রজাদের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন স্বয়ং মা দুর্গা। কথিত, যে গুহায় বর্তমানে হিংলাজ মাতার মন্দির, সেই গুহা পর্যন্ত ধাওয়া করে মা দুর্গা হিঙ্গোলকে বধ করেন। মৃত্যুর আগে এই জায়গার নাম তার নামে রাখার জন্য হিঙ্গোল প্রার্থনা করে। মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শেষ ইচ্ছা মা দুর্গা পূরণ করেছিলেন। হিংলাজ মাতার আরেকটি কিংবদন্তীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতির নাম। পরশুরাম যখন অনাচারী ক্ষত্রিয়দের শাস্তি দিচ্ছিলেন তখন কয়েকজন ব্রাহ্মণ ১২ জন ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। কথিত, ওই ১২ জন ক্ষত্রিয়ের নিরাপত্তার নির্দেশ এসেছিল স্বয়ং হিংলাজ মাতার কাছ থেকে। সেই ব্রাহ্মণবেশী ক্ষত্রিয়দের বংশধররাই আজকের ব্রহ্মক্ষত্রিয়। এই উপাখ্যানের অন্য একটি ব্যাখ্যাও বিদ্যমান। কথিত, পরশুরামের কোপ থেকে রক্ষা করার জন্য মুনি দধীচি সিন্ধের রাজা রত্নসেনকে তাঁর আশ্রমে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যদিও কোনো কারণে আশ্রমের বাইরে বেরিয়ে আসায় পরশুরাম তাকে বধ করতে সমর্থ হন। তার ছেলেরা আশ্রমে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে অন্যতম জয়সেন দধীচির দেওয়া হিংলাজ মাতার মন্ত্রে সুরক্ষিত হয়ে সিন্ধের শাসনভার কাঁধে তুলে নেন। হিংলাজ মাতা যে শুধু জয়সেন ও তার সহোদরদের রক্ষা করেছিলেন তাই নয়, তাঁর নির্দেশে পরশুরামও পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়হীন করার ব্রত ত্যাগ করেন।

পাকিস্তানের শাসকবর্গ কিংবা তাদের আশ্রিত কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী এই মন্দিরে হাত দেবার সাহস দেখায়নি। এর একটা কারণ যদি হয় দেবীমাহাত্ম্য, অন্যটি অবশ্যই হিংলাজ মাতার প্রতি স্থানীয় বালুচদের আবেগ। হিংলাজ মাতা তাদের আদরের নানি (দিদিমা)। মন্দিরটি পরিচিত 'নানি কি মন্দির' নামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক যে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন তাতে 'নানা' নাম্নী এক দেবীর মুখ মুদ্রিত ছিল। নানা আর নানি সম্ভবত একই। প্রতি বছর বালুচ-রা হিংলাজ মাতাকে দর্শন করে পুজো দেন। বহুদিন ধরে প্রচলিত এই প্রথাকে বলে নানি কি হজ। হিংলাজ মাতার করুণায় হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যায়। সম্প্রতি এই অঞ্চলে একটি মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজ বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে। গুহামন্দির আলোকিত করার জন্য একটি ডিজেল জেনারেটর কেনা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের জন্য গণ- রন্ধনশালার ব্যবস্থা

লাহোর দুর্গে লবের শূন্য মন্দির।

গোরক্ষনাথ মন্দির : প্রায় মসজিদে রূপান্তরিত।

করা হয়। সব ব্যবস্থা করেন স্থানীয় বালুচ-রা। দিনে তিনবার খাবার পরিবেশন করা হয়। তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট শিবিরগুলিতে বাথরুম থেকে শুরু করে সব ব্যবস্থাই বর্তমান। সবই আছে অথচ কী যেন নেই! কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতের মানুষের হিংলাজ মাতাকে দর্শন করার উপায় নেই। এই একটি অপ্রাপ্তির জন্য সব পাওয়া এক লহমায় বিবর্ণ হয়ে যায়।

সূর্যমন্দির, মুলতান :

ভবিষ্য এবং স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববতীর একমাত্র সন্তান শাম্বের কুষ্ঠ হয়েছিল। অনেকে মনে করেন মারাত্মক রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য শাম্ব এই সূর্যমন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রাচীনকালে মুলতানের নাম ছিল কশ্যপপুরী। ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক সেনানায়ক স্কাইল্যাক্স এখানে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে তিনি এই অঞ্চলকে কশ্যপপুরী বলে উল্লেখ করেছেন।

মন্দিরের সূর্যমূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায় হিউয়েন সাঙের লেখায়। তিনি এখানে এসেছিলেন ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় মূর্তিটি ছিল আগাগোড়া সোনার তৈরি। চোখদুটি চুনির। মন্দিরের দরজায়, স্তম্ভে এবং শিকারায় সোনারুপো এবং অন্যান্য দামি রত্নের বর্ণময় সম্ভার। হাজার হাজার হিন্দু দর্শনার্থী এবং ভক্তের নিয়মিত ঢল নামত মন্দিরে। হিউয়েন সাঙ দেবদাসী প্রথার কথা লিখলেও সমসাময়িক অন্য পর্যটকদের লেখায় তার সমর্থন মেলেনি। পরবর্তীকালে মন্দিরে শিব ও বুদ্ধদেবের মূর্তিও স্থান পেয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটল। ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম মুখ উমায়েদ খলিফার নির্দেশে মহম্মদ বিন কাশিম মুলতান ধ্বংস করে মন্দিরের দখল নেয়। অবাধে লুঠতরাজ চলে। একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য, আসল মূর্তিটি চুরি করে সেই জায়গায় লাল চামড়ায় ঢাকা কাঠের মূর্তি বসানো হয়। শুধু চোখের চুনিদুটি আর মাথার স্বর্ণখচিত মুকুটটি অক্ষত ছিল। মন্দির ও বিগ্রহকে অপবিত্র করার উদ্দেশ্যে মহম্মদ বিন কাশিম মূর্তির মাথার কাছে একটুকরো গোমাংস রেখে দিত। দুর্ভাগ্য কাশিমের, এত কিছুর পরেও ভক্তের সংখ্যা কমেনি।

মন্দিরের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকায় পরবর্তীকালে এক ঘৃণ্য রাজনীতি শুরু হয়েছিল। যখনই কোনো হিন্দু রাজা মুলতান আক্রমণ করার কথা ভাবতেন, সেখানকার মুসলমান শাসক সূর্যমন্দির ভেঙে দেওয়ার বা অপবিত্র করার ভয় দেখাতেন। পিছিয়ে যেতেন হিন্দু রাজারা। ভাবলে আশ্চর্য লাগে কেউ একবার ভেবে দেখেননি, মন্দির আগেই একবার অপবিত্র হয়েছে। মূর্তিও লুট হয়ে গেছে। সুতরাং নতুন করে কিছু হারাবার ছিল না। মুলতান এবং মন্দিরের দখল নিতে পারলেই বরং পুরনো মূর্তি আবার নতুন করে তৈরি করা যেত। মন্দিরকে আবার স্বমহিমায় ফেরানো যেত। ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে গজনির সুলতান মামুদ মন্দিরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। আল বিরুনি লিখেছেন, একাদশ শতাব্দীতে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা আর মুলতানে যেত না। কারণ সেখানে সূর্যমন্দিরের আর কোনো চিহ্নই ছিল না।

মন্দিরটি মুলতানের ঠিক কোথায় ছিল এখন আর তা জানার কোনো উপায় নেই। যদিও অনেকেই গবেষণা করছেন জানার জন্য।

কেতসরাজ মন্দির, চাকওয়াল :

এই মন্দিরের উৎসের সন্ধান পেতে হলে চলে যেতে হবে মহাভারতের যুগে। অজস্র জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে মন্দিরটি ঘিরে। অনেকে মনে করেন পাণ্ডবেরা তাদের

নির্বাসনের (মোট ১৩ বছরের) চার বছর এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সামান্য দূরে সে সরোবরটি আজও বিদ্যমান— তার উৎসেও রয়েছে বিশ্বাস এবং পরম্পরা। কেউ কেউ মনে করেন সতীর দেহত্যাগের পর বিষণ্ণ হতাশ শিবের অশ্রুপাতের ফলে এই সরোবর সৃষ্টি হয়েছিল (অনুরূপ কাহিনি আজমেঢ়ের পুষ্কর হ্রদ সম্বন্ধেও প্রচলিত)। আবার অনেকে মনে করেন, যে জ্ঞানী যক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যুধিষ্ঠির মৃত সহোদরদের জীবন ফিরে পেয়েছিলেন, তার বাসস্থান ছিল এই সরোবরে। এইখানেই শেষ নয়। অনেকের বিশ্বাস, শিবের ঘোড়া কেতক্ষের (কেতক্ষ > কেতক্স্ > কেতস) নাম অনুসারে এখানকার নামকরণ হয়েছে। এখানকার শিবলিঙ্গই বিশ্বের প্রাচীনতম বলে তাঁদের ধারণা।

কেতসরাজ মন্দির হিন্দু স্থাপত্যের সাতগ্রহ শৈলীতে নির্মিত। অর্থাৎ একটি কেন্দ্রীয় মন্দিরের চারপাশে অনেকগুলি মন্দির। কেন্দ্রীয় মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন শ্রীরাম, হনুমানজী।

রাজা হরি সিং মন্দির প্রাঙ্গণে একটি হাভেলি তৈরি করেছিলেন। শ্রীরামের মন্দিরটি তাঁর হাভেলির কাছেই। তিনদিক বন্ধ শুধু প্রবেশদ্বারটি খোলা। হনুমানজীর মন্দিরটির অবস্থান প্রাঙ্গণের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে। এ ছাড়া আরও অনেক দেবী-দেবতার মন্দির রয়েছে।

১৯৪৭-এ দেশভাগের পর এই মন্দিরে ভক্ত সমাগমে ভাটা পড়েছে। মূলত উত্তর পঞ্জাবের হিন্দুরাই এখন আসেন। ভারত থেকেও মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রীরা যান।

লব মন্দির, লাহোর :

শ্রীরামচন্দ্র হিন্দুদের দেবতা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের একটি মন্দির একসময় লাহোরে ছিল। এখন আর তার কোনো চিহ্ন মেলে না।

'দেশোয়াভাগ' গ্রন্থে লাহোর শহরকে লবপুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজপুতানার প্রাচীন লেখাপত্রে লাহোরকে বলা হয়েছে লোহ্ কোট, যার অর্থ লবের দুর্গ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন লাহোর

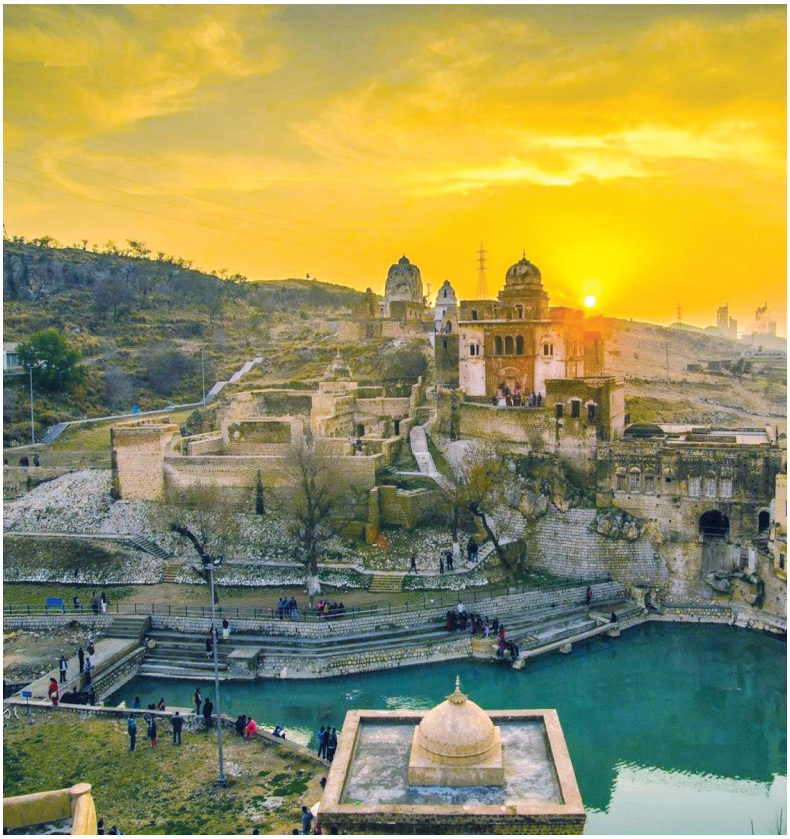

কেতসরাজ মন্দির।

শহরের পত্তন লবের হাতেই হয়েছিল। হিন্দুদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিরাচরিত পন্থা অনুযায়ী এখানে গড়ে উঠেছিল লবের মন্দির। অদূরেই কসুর শহর। পণ্ডিতদের অনুমান এই শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন শ্রীরামের কনিষ্ঠ পুত্র কুশ। লাহোর দুর্গে আজও একটা বিগ্রহহীন শূন্য মন্দির লবের নামে উৎসর্গীকৃত। অপৌত্তলিক মুসলমানরা সম্ভবত ওই শূন্যতাকেই লব বলে কল্পনা করে নেন।

বিশ্বজুড়ে কাফেরিয়তের প্রতি তীব্র ঘৃণাও যাঁর কল্পনাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারে না, তাঁকে এবং তাঁর ঈশ্বরপ্রতিম জনককে, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, আজও ভারতের কতিপয় ঐতিহাসিক 'কাল্পনিক চরিত্র' বলে অবজ্ঞা করে থাকেন।

পাকিস্তানে এক সময় অনেক মন্দির ছিল। এখন সম্ভবত তিরিশটাও হবে না। তার মধ্যে আবার বেশিরভাগই খুব সাধারণ। এখানে টিলা যোগিয়াঁর কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পরিসরের অভাবে বলা গেল না। টিলা যোগিয়াঁ একাধারে শিখ ও হিন্দু মন্দির। শিখদের প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী গুরুনানক এখানে ৪০ দিন ধরে ধ্যান করেছিলেন। মুঘল বাদশাহ্ আকবর এবং জাহাঙ্গীর এখানে এসেছিলেন। আরও একজন ব্যক্তি এসেছিল। তার নাম আহমদ শাহ আবদালি। এসে এখানকার মন্দির লুঠ করে প্রচুর হিরেজহরত নিয়ে দেশে ফিরে যায়। টিলা যোগিয়াঁ নিয়ে পরে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে রইল।

ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। ভারতীয় চিন্তাচেতনার ওপর বৌদ্ধিক সন্ত্রাসের শুরু সেই সময় থেকে, যা এখনও বিদ্যমান। যদিও ভারত স্বাধীন দেশ, হিন্দুরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবুও...। অন্যদিকে পাকিস্তানে হিন্দুরা সংখ্যায় নগণ্য। তাঁরা যে এই বৌদ্ধিক সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে গিয়ে ক্রমশ নিজেদের শিকড় হারিয়ে ফেলবেন সেটা স্বাভাবিক। আশার কথা, হিংলাজ মাতা আছেন। বালুচিস্তান আছে। হিন্দু সভ্যতা ঘা খাবে, রক্তাক্ত হবে কিন্তু আবার উঠে দাঁড়াবে।

পাকিস্তানে কয়েকটি হিন্দু মন্দির			
মন্দিরের নাম	**দেবী/দেবতা**	**অঞ্চল**	**বর্তমান অবস্থা**
হিংলাজ মাতা গুহা মন্দির	হিংলাজ মাতা	বেলুচিস্তান	অক্ষত
কালাত কালীমন্দির	কালী	বেলুচিস্তান	অক্ষত
কালীবাড়ি মন্দির	কালী	পেশোয়ার	অক্ষত
গোরক্ষনাথ মন্দির	শ্রীকৃষ্ণ	পেশোয়ার	অক্ষত
বাল্মীকি মন্দির	বাল্মীকি	পেশোয়ার	ভগ্নস্তূপে পরিণত
আর্য মন্দির	অজ্ঞাত	অ্যাবোটাবাদ	ধ্বংস হয়ে গেছে
শিব মন্দির ও দশেরা হাউজ	শিব	অ্যাবোটাবাদ	ধ্বংস হয়ে গেছে
পুরনো কৃষ্ণমন্দির	শ্রীকৃষ্ণ	অ্যাবোটাবাদ	ধ্বংস হয়ে গেছে
কালীমন্দির	কালী	দেরা ইসমাইল খান	হোটেলে পরিণত
কৃষ্ণমন্দির	কৃষ্ণ	হরিপুর	ধ্বংস হয়ে গেছে
পুরনো শিবমন্দির	শিব	মনশেহ্‌রা	অক্ষত
শিবমন্দির	শিব	মনশেহ্‌রা	ভেঙে ফেলা হয়েছে
বেরেরি মাতা/দুর্গামন্দির	দুর্গা	মনশেহ্‌রা	ধ্বংস হয়ে গেছে
লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির	লক্ষ্মীনারায়ণ	মারদান	অক্ষত
শিবমন্দির	শিব	নওশেরা	অক্ষত
আদিত্য সুর্যমন্দির	সূর্য	মুলতান	ধ্বংস হয়ে গেছে
জগন্নাথ মন্দির	জগন্নাথদেব	শিয়ালকোট	অক্ষত
কেতসরাজ মন্দির	শিব	কাটাসগ্রাম/চাকওয়াল	অক্ষত
কৃষ্ণমন্দির	কৃষ্ণ	লাহোর	অক্ষত
লব মন্দির	লব (শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র)	লাহোর	ধ্বংস হয়ে গেছে
টিলা যোগিয়াঁ মন্দির	দুর্গা	—	অক্ষত
শ্রীনরসিংহ মন্দির	নরসিংহদেব	মুলতান	ধ্বংস হয়ে গেছে
সাধু বেলা মন্দির	অজ্ঞাত	শুক্কুর	ধ্বংস হয়ে গেছে
শঙ্করানন্দ ভারতী	অজ্ঞাত	শিকারপুর	ধ্বংস হয়ে গেছে
ঝুলেলাল মন্দির	শ্রীকৃষ্ণ	বাগারজি/শুক্কুর	অজ্ঞাত
দরিয়ালাল সঙ্কটমোচন মন্দির	হনুমানজী	করাচি	ধ্বংস হয়ে গেছে
নরসিংহ মহাদেব মন্দির	অজ্ঞাত	করাচি	অজ্ঞাত
পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির	হনুমানজী	করাচি	ধ্বংস হয়ে গেছে
বরুণদেব মন্দির	বরুণদেব	মানোরা/করাচি	পরিত্যক্ত
(গত তিন দশকে পাকিস্তানে তিন শতাধিক হিন্দু মন্দির হয় ধ্বংস হয়েছে নয়তো পরিত্যক্ত হয়েছে। স্বল্প পরিসরে সব নাম দেওয়া সম্ভব নয়। যেসব মন্দির এখনও অক্ষত (!) আছে এবং যে সব বিশেষ মন্দির ধ্বংস হয় তাদের নামই এখানে উল্লেখ করা হলো।)			

চিঠিপত্র

ভোট সর্বস্ব রাজনীতি

সুজাত বুখারি সাহেব সম্প্রতি এক বাংলা দৈনিকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আলোচনা করেছেন। তাতে প্রাথমিক ভাবে দুটো প্রশ্ন রেখেছেন। প্রথম প্রশ্ন— সময় নির্বাচন। প্রশ্ন হলো, সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে গিয়ে যদি তার নিজস্ব দল বিজেপি কোনো সুবিধা পায়, তাতে আপনার অসুবিধা কোথায়? আলোচনা করবেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ভারতীয় জনগণের পক্ষে ভাল কী মন্দ। ভাল হলে কী কী কারণে ভাল এবং মন্দ হলে কী কী কারণে মন্দ। কোন্ দেশের কোন্ সরকার তার নিজের দলের সুবিধা দেখেনি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই ভারতীয়, তাহলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হলে কেন শুধু একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে নিশানা করা হবে? আপনার কথা থেকে প্রমাণ হয় যে ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রবর্তনে মুসলমানরাই একটা বিরাট বাধা। ভারতে সব ধর্মের মানুষকে এক এবং অভিন্ন ভারতীয় করার পক্ষে তারাই একমাত্র অন্তরায়। তারা মুসলমানই থাকতে চায়, ভারতীয় হতে চায় না।

পাকিস্তান-সহ বাইশটি দেশে তিন তালাক প্রথা রদ হয়েছে। সেটা দেখেও যদি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড রদ করতে রাজি না হয় তাহলে মুসলমান সমাজ কি মধ্যযুগেই থেকে যাবে না? সুজাত সাহেবকে একটি প্রশ্ন, একজন হিন্দু দু'টি বিয়ে করলে যে মুসলমান অফিসার তাকে অ্যারেস্ট করবেন, তার তিনটে বিয়ে। আর যে মুসলমান বিচারক তাকে জেলে পাঠাবেন তার চারটি বিয়ে— আপনি কি এরকম চান?

আপনি বার বার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বলেছেন। কিন্তু সরকারটা ভারত সরকার, তা সে যে পার্টিরই হোক। এটা না বুঝবার মতো অজ্ঞ আপনি নন। তাহলে বিকৃতি কেন করছেন, কী অভিসন্ধি আপনার? আপনার কলমে উঠে এসেছে আজলাক আহমেদের কথা। কিন্তু যখন জম্মুর পণ্ডিতদের অত্যাচার করে ভিটাছাড়া করা হয় তখন আপনার কলমের কালি কি শেষ হয়ে যায়?

তিন তালাক সম্পর্কে আপনি বলেছেন প্রাজ্ঞ মুসলমানরাই তা ঠিক করবেন। প্রাজ্ঞ বলতে যদি জ্ঞানী বুঝায় তাহলে অবশ্যই তাঁরা এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে, আর যদি প্রাজ্ঞ বলতে আপনি কোরান বিশেষজ্ঞ বলেন, তাহলে তো কোরানের বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই। অতএব তালাক চলবে আর আপনার মতো প্রাজ্ঞজনেরা সেটা সমর্থনও করবেন।

—কিশোর বিশ্বাস,
হৃদয়পুর, কলকাতা-৭০০১২৭।

খিলজি-র নবদ্বীপ বিজয় মিথ্যা

খিলজি-র ভয়ে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কাপুরুষের মতো নবদ্বীপ থেকে নৌকাযোগে পালিয়েছিলেন। এই বিষয়ে সম্প্রতি একটি দৈনিকে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—

''সেন বংশের শেষ স্বাধীন নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। মগধ বিজয় করে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি নবদ্বীপ থেকে লক্ষ্মণসেনকে বিতাড়িত করে গৌড়বঙ্গ দখল করেন। গৌড়বঙ্গের রাজধানী স্থানান্তরিত হলো মালদহে।'' (দ্যোতিনীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইংরাজি ১৫.৮.১৬ বর্তমান সংবাদপত্র দ্রঃ)।

নবদ্বীপে সেন বংশের রাজধানী ছিল এমন কোনো লিখিত তথ্য সেন রাজবংশের তাম্রশাসন-প্রশস্তিতে নেই। ১৭৮৫ ইংরাজি বর্ষের পূর্বে 'নদীয়া' নামে কোনোই জেলা ছিল না। পাঠান আমালের শেষ দিকে পরগনা বিভক্তি ঘটে। সেই কালে অলকানন্দার দক্ষিণে 'নদীয়া' নামে একটি পরগনার সৃষ্টি হয়। সরকার সাতগাঁও-য়ের বাহান্ন পরগনার একটি হচ্ছে 'নদীয়া'। নবদ্বীপ এই 'নদীয়া' পরগনার মধ্যেই নয়। নবদ্বীপের পরগনা হচ্ছে 'ওকেরা', উচ্চারণ ভেদে 'উখারা'। কিন্তু মিনহাজের বর্ণনায় ইকতিয়ারউদ্দিন বিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি নোদীয়হ্ জয় করেন মগধ বিজয়ের বেশ কিছুদিন পরে। মনে রাখতে হবে, সেই ঘটনার পঞ্চাশ বছরের অধিককাল পরে মিনহাজ উদ্দিন দিল্লীতে বসে কিতাব লিখেছেন, সরেজমিনে আসেননি, কোনো বিজ্ঞজনের পরামর্শও নেননি, লৌকিক রটনা-ই তার ইতিহাস। যা হোক, এই 'নোদীয়হ্' উচ্চারণ ভেদে 'নুদীয়া' ঠিক কোথায়?

রামাবতী শহরের অদূরে বল্লালসেন কর্তৃক পত্তন দেওয়া শহর হচ্ছে লক্ষ্মণাবতী বা লখনৌতি। এই লক্ষ্মণাবতী শহর-ই ছিল মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী এটি ইতিহাস সম্মত। মিনহাজ লিখেছেন, লখনৌতি গঙ্গার যে কূলে সেই কূলেই 'নোদীয়হ্' এবং নোদীয়হের পূর্বদিকে 'কোটিবর্ষ'। গঙ্গার উত্তরকূলে লক্ষ্মণাবতী, তাহলে গঙ্গার উত্তরকূলেই নোদীয়হ। 'কোটিবর্ষ একটি ভুক্তির নাম। এই ভুক্তি-র পশ্চিম সীমায় কৌশিকী নদী। কোটিবর্ষ নামে নগরটি 'পুনর্ভবা' নদীর পূর্বকূলে। তাহলে মিনহাজের নোদীয়াহ্ কৌশিকী নদীর পশ্চিমেই যা তীরভুকি (তীরহুত) নামেই পরিচিত ছিল সেই যুগে। কেউ কি আমায় দেখাতে পারবেন নবদ্বীপের পূর্ব দিকে কোটিবর্ষ? এখানেই ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে।

একথা সত্য, বল্লালসেনের জীবদ্দশায় প্রথম জীবনে লক্ষ্মণসেন তীরভুক্তি-তে ভুক্তিপতি ছিলেন। যুগপৎ লক্ষ্মণসেন অসামান্য সুশাসকও ছিলেন। তাঁর অবদান অজস্র। লক্ষ্মণসেন ৫৫৬ বাঙ্গলা সনে তীরভুক্তিতে ভুক্তিপতি পদে যোগদান করে। তার নামেই তীরভুক্তিতে 'লক্ষ্মণ সংবৎ'-এর চলন হয়। অধুনা এই সনটি 'লসৎ' নামে পরিচিত ওই অঞ্চলে। বল্লালসেন দেহরক্ষা করলে (ভারতবর্ষে ত্রিবেণী তীর্থ তিনটি— ঢাকা-হুগলী-এলাহাবাদে। কোন্ ত্রিবেণী-তে বল্লালসেন গঙ্গাজলি হয়েছিলেন তা আমার জানা নেই।) ইংরাজি ১১৭১ বর্ষে লক্ষ্মণসেন

লক্ষ্মণাবতীতে রাজপদ অলঙ্কৃত করেন। বখতিয়ারের ছেলে ইখতিয়ার খিলজি লখনৌতি আক্রমণ করেছিলেন এমন কথা মিনহাজ লেখেননি। সেই সময় তীরভুক্তিতে ভুক্তিপতি কে ছিলেন? মিনহাজের বর্ণনায় নোদীয়হের রাজা ছিলেন লছমনিয়া। এটা তার শোনা কথা, সত্য বলে মনে হয় না। মিঞা ইখতিয়ার খিলজি লুঠেরা মাত্র ছিলেন— শাসক ছিলেন না। মগধ রাজ্য ধ্বংস করে অতঃপর তিনি তীরভুক্তিতেই ঝাঁপিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে দলবল নিয়ে তিনি কোটিবর্ষের যথেষ্ট উত্তর দিক দিয়ে অসমে যাত্রা করেন। পরের কথা সকলেরই জানা।

এখন কথা হলো, ইকতিয়ারের আক্রমণকাল পর্যন্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেন জীবদ্দশায় ছিলেন কি? এটা কিন্তু বড় প্রশ্ন। অনুমান, তিনি তখন জীবদ্দশায় ছিলেন না। ঠিক এই সুযোগেই মগধে গোবিন্দলাল গৌড় সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হন। ফলস্বরূপ খিলজির আক্রমণ কালে গৌড়ের সাহায্য গোবিন্দপাল চাইতেও পারেননি। ঠিক একই দুর্দশা কি তীরভুক্তিতেও ঘটেছিল? এর সদুত্তর আমার জানা নেই। তবে এখানে অনুমান করা যায় যে অপঘাতে খিলজির মৃত্যু হলে পরে তীরভুক্তিকে অরিরাজদনুজমাধব অধিকার করেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে মুগীসুদ্দিন ইউসবক দ্বিতীয়বার নুদীয়া বা নোদীয়হ্ জয় করেন। কমবেশি পাঁচ বছরের মধ্যেই মুগীসুদ্দিন লখনৌতি জয় করেন। সেই সঙ্গে তিনি বৌদ্ধদের উপরে অতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার শুরু করেন। অত্যাচারের তীব্রতা এতোই প্রকট ছিল যে, আতঙ্কিত বৌদ্ধরা দলে দলে নবিয়তি ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়। (মোল্লাদের তীব্র বৌদ্ধ বিদ্বেষের কারণ হচ্ছে ওই সময়ে বৌদ্ধ হলাগু খাঁ কর্তৃক বাগদাদের খলিফা মুস্তাসিম বিল্লা নিধন।) সামান্য সংখ্যক বৌদ্ধ বৈদিক সমাজে আত্মগোপন করে। চৈতন্য মঙ্গল কাব্যে এরা 'পলাতক বৌদ্ধ' বলেই পরিচিত। ওই সময়ে কিন্তু চণ্ডাল-বাগ্‌দি প্রভৃতি অবৈদিক ও অবৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির উপরে কোনো অত্যাচার হয়নি।

পারডাঙ্গা তথা বারডাঙ্গা (আধুনিক নাম শ্রীমায়াপুর) মৌজার উত্তরদিকে বল্লালঢিবি বলে প্রচারিত যে ঢিবি, ওই ঢিবির সঙ্গে বল্লালসেনের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। ওটার নিম্নদেশ কোনো বৌদ্ধ বিহার অথবা বৌদ্ধ চৈত্য বলেই মনে হয়। এটি ইংরাজি ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে ভাঙা পড়ে মোল্লাদের বৌদ্ধ বিদ্বেষের ফলে। পরবর্তী কালে ধ্বংসস্তূপের উপরে শিব মন্দির গড়ে উঠেছিল বলেই মনে হয়। অনুমান, শিবলিঙ্গটি অধুনা পারডাঙ্গার শিব নামে পরিচিত হয়ে নবদ্বীপধামে পূজিত হচ্ছে। কথা সত্য, প্রথম কালাপাহাড় নবদ্বীপে ধ্বংসলীলা চালায়। লুণ্ঠনের তীব্রতা এতোটাই প্রকট ছিল যে, মন্দিরের শিখরকলস থেকে আরম্ভ করে পনসবৃক্ষও (কাঁঠালগাছ) বাদ যায়নি।

—মৃণাল হোড়,
চুঁচুড়া, হুগলী।

মোদীর উপর ভারতবাসীর আস্থা

প্রত্যেক শাসকেরই উচিত ন্যায়নীতির ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করা। 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' করে। শাসনকার্যে শাসকের নিরপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'দুষ্ট কোন ধর্মের, কোন গোত্রের, কোন বর্ণের বা কার আত্মীয় এসব বিচার বিবেচনার প্রয়োজন নেই। কঠোর শাস্তিই তার জন্য একমাত্র বিচার— এটাই নিরপেক্ষতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর বিকল্প হলেই বুঝতে হবে শাসক নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। ধর্মের সঙ্গে শাসনব্যবস্থা এক করা উচিত নয়। 'ধর্ম যার যার, দেশ সবার'— এই নীতিই শাসকের শাসনকার্যে অবশ্যই থাকতে হবে, এ না হলে শাসনব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারত দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়। ভারত ও পাকিস্তান দু'টি দেশের জন্ম নেয়। পাকিস্তান হলো শুধুমাত্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। এখানে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের, বর্ণের, গোত্রের মানুষের স্থান নেই। সঙ্গত কারণেই ভারত হওয়া উচিত ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, জাতীয় নেতাদের ক্ষমতার মোহ এতই অন্ধ করেছিল যে, ভারত হলো সকল ধর্ম, বর্ণ-সহ মুসলমান জনগোষ্ঠীর এক নিরাপদ আবাসস্থল। পরিণামে মুসলমান জনগোষ্ঠী দু'টি আবাসস্থল লাভ করল, পরবর্তীতে তিনটি অর্থাৎ বাংলাদেশে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভারতে চলল বিশেষ এক সম্প্রদায়ের তোষণ। সেই ধারা আজও অব্যাহত। পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের যেভাবে নির্যাতন করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাবানদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। ১৯৮৪ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায়, কিন্তু শিখ দাঙ্গা থামানো যায়নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য সুযোগসন্ধানীরা সব সময় তৎপর থাকেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেন। ২০০২ সালে গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করা হয়। ন্যায় আদালত নরেন্দ্র মোদীকে ক্লিন চিট দিয়েছে। এর পরেও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভেকধারীরা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের সর্বনাশ হবে, এমনসব অর্বাচীনের মতো কথা বলে। ২০০২ সালের পরে গুজরাটে আর কোনো দাঙ্গা হয়নি।

ধর্মনিরপেক্ষ ভেকধারীরা ভুলেও ১৯৮৪ সালের দাঙ্গার কথা মুখে আনেন না, এটা এক ধরনের অপরাধ। কেরলে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগের সঙ্গে আঁতাত করে সরকার গঠন করে তাতে কোনো দোষ নেই। কংগ্রেস থেকে বিজেপি-তে যোগদান করলে তিনি হবেন সাম্প্রদায়িক এবং বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যোগদান করলে তিনি হবেন অসাম্প্রদায়িক। ধর্মনিরপেক্ষ ভেকধারীরা শুধু অপকৌশলে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে মোদীর চরিত্রে কালিমা লেপনের অপচেষ্টায় লিপ্ত। আশ্চর্যের বিষয়, মোদীর পরিবর্তে আদবানী এলে তাদের বিশেষ আপত্তি নেই। আসল কথা, মোদীর বিরাট ব্যক্তিত্বকে এরা ভয় পায়। নিন্দুকেরা যতই মোদী বিরোধী প্রচারে লিপ্ত হবেন, ততই মোদী ভারতবাসীর আস্থা অর্জন করবেন। সেই পুরানো প্রবাদ 'জয় কালে ক্ষয় নেই, মরণ কালের ওষুধ নেই'।

—শঙ্করলাল দাস,
বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪।

এক নিঃসঙ্গ ঈশ্বরী—দেবীসারদা

সন্দীপ চক্রবর্তী

পিতা দক্ষের যজ্ঞস্থলে স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। পরমপ্রিয় পত্নীর অপমৃত্যু সহ্য করতে পারেননি শিব। যুগপৎ বিরহ এবং ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সমগ্র বিশ্ব চরাচরে সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। প্রমাদ গুণেছিলেন দেবতারা। শিবের রোষাগ্নিতে ত্রিভুবন ছারখার না হয়ে যায়! অতঃপর বিষ্ণুর চক্রধারণ। চক্রের আঘাতে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। কালক্রমে সেই সব জায়গায় গড়ে উঠল একান্নটি শক্তিপীঠ।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সারদাপীঠের ভগ্নদশা।

এই নিবন্ধের বিষয় এমনই একটি শক্তিপীঠ। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ভারতের মানুষ সেখানে যেতে পারেন না। কারণ এই শক্তিপীঠের অবস্থান পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের সারদা গ্রামে। এই গ্রামে দৈবাৎ যদি কেউ পা রাখে তা হলে অবশ্যই তার চোখে পড়বে প্রায় ধ্বংস হতে বসা একটি মন্দির। প্রাচীন কৌলিন্যের ছিটেফোটাও আর অবশিষ্ট নেই। ভূস্বর্গের অপার্থিব সৌন্দর্য যেন হঠাৎ ম্লান হয়ে গেছে। চারিদিকে গা-ছমছমে নৈঃশব্দ। এখানে সতীর ডান হাত পড়েছিল। কিন্তু অনুদার বিধর্মীর বরাভয়দাত্রী সেই হাতের মাহাত্ম্য বোঝেনি। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা অর্থাৎ সরস্বতী। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফ্‌রাবাদের ২০৭ কিলোমিটার উত্তরে গেলেই পড়বে সারদা গ্রাম। মুজফ্‌রাবাদ থেকে গাড়ি বা বাসে যাওয়া যায়। নীলমভ্যালি, জাগরান ভ্যালি কুন্দল শাই, আথমাকুয়াম্ এবং দোয়ারিয়ন পেরিয়ে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা মাত্র মুসলমান কনডাক্টর হাঁক পাড়বে, 'সারদা মাঈ! সারদা মাঈ!' বিস্মিত হবেন না পাঠক। সারদাপীঠকে প্রায় ধ্বংস করে ফেললেও ইসলামের কঠোর প্রবক্তারা সাধারণ মুসলমানদের স্মৃতি থেকে এখনও তাদের পিতৃপিতামহের মুখে শোনা সারদা মাঈ-য়ের সোনালি অতীত মুছে ফেলতে পারেননি। তাই কাফেরিয়ৎ কায়েম করতে চাওয়া বত্তমিজ হিন্দুর ঈশ্বরীকে মা সম্বোধন করতে তাদের বাধে না।

বাস রাস্তা থেকে মন্দির বেশ অনেকটাই দূরে। নদীর কলস্বর শুনতে পাওয়া যায়। নদীর নাম আগে ছিল মধুমতী, মতান্তরে কৃষ্ণগঙ্গা। এখনকার নাম অবশ্য নীলম। একদা মধুমতীর তীরে ছিল মহর্ষি শাণ্ডিল্যের আশ্রম। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত আছে, দীর্ঘ তপস্যার পর মহর্ষি দেবী সরস্বতীর দর্শন পেয়েছিলেন। সারদাপীঠের মাহাত্ম্য অনেক কিন্তু অবস্থা করুণ।

মন্দিরের ভগ্নদশার কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রবেশদ্বারও বন্ধ। মন্দিরটি পুনরায় খোলার জন্য কাশ্মীরি পণ্ডিতরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন। তাঁদের আরও একটি দাবি, সারদা মাঈ-য়ের বাৎসরিক স্নানযাত্রা আবার শুরু করা হোক। বস্তুত এই স্নানযাত্রা দেশভাগের আগেও প্রতি বছর ভাদ্র মাসে পালিত হোত। ২০০৪ সালে ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতির জন্য পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ সারদাপীঠ সংস্কারের ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন বলে সার্ক বৈঠকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তীর্থযাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে দেবীদর্শন করতে পারেন তার জন্য ২০০৬ সালে ৮ কোটি টাকা তিনি মঞ্জুরও করেছিলেন। কিন্তু সেই টাকায় রিসর্ট হলো, গেস্ট হাউস হলো কিন্তু মন্দির সংস্কার হলো না। মন্দিরের দরজাও খুলল না। অথচ এই উপেক্ষা আর অবজ্ঞার আড়ালে রয়েছে অন্য কণ্ঠস্বরও। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ড. গুলাম আজহার তাঁর সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে সারদা মন্দিরকে এই অঞ্চলের প্রাচীনতম মন্দির বলে উল্লেখ করে, অবিলম্বে মন্দিরটির সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ দাবি করেছেন। তিনি লিখেছেন, অতীতে মন্দিরটি ছিল হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ভগ্নস্তূপে পরিণত হলেও মন্দিরের খিলান, মিনার এবং দেওয়ালে খোদিত শিল্পকর্মগুলি প্রাচীন গৌরবগাথার সাক্ষ্য দেয়।

সারদাপীঠের সব থেকে বড়ো আকর্ষণ ছিল স্নানযাত্রা। প্রবীণেরা বলে থাকেন বহু প্রাচীনকাল থেকে এই স্নানযাত্রা পালিত হয়ে আসছে। তবে তা ছিল অনিয়মিত। ডোগরা রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৮৪৬-র পর থেকে নিয়মিত হয়ে ওঠে। প্রতি বছর ভাদ্র (আগস্ট) মাসের শুক্ল পক্ষ থেকে যাত্রা শুরু হোত। সাধারণত ভাদ্র মাসের ৪ থেকে ৮ তারিখের মধ্যে যাত্রীরা মধুমতী নদীর নিকটবর্তী সারদাকুণ্ডে স্নান এবং পিতৃপুরুষের তর্পণ করতেন। তারপর কুণ্ড থেকে ফিরে সারদাদেবীর দর্শন। মূলত কাশ্মীরি পণ্ডিতেরাই ছিলেন স্নানযাত্রী। 'সারদা মাঈ কী জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত ভূস্বর্গ। আর শোনা যেত কাশ্মীরি ভাষায় সরস্বতী বন্দনা— 'নমস্তে সারদাদেবী কাশ্মীর পুরবাসিনী ত্বমোহহম্ প্রার্থিয়ে নিত্যম্ বিদ্যা দানং চ দেহি মে।' অর্থাৎ তোমাকে প্রণাম করি হে সারদা, হে দেবী, হে কাশ্মীর পুরবাসিনী, আমি তোমার বন্দনা করি, আমাকে প্রজ্ঞা দান করো।

সারদাপীঠের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১০০০ ফুট উচ্চে। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১৪২ ফুট এবং প্রস্থ ৯৪.৬ ফুট। সীমানা প্রাচীরটি

১১ ফুট লম্বা, চওড়া ৬ ফুট। খিলানগুলির উচ্চতা ৮ ফুট। যদিও এসব এখন গল্প কথা। কিন্তু যে সারদাপীঠকে স্বয়ং শঙ্করাচার্য 'সর্বজনপীঠ' আখ্যা দিয়েছেন তার ইতিহাস সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন।

১৮৭২ সালে কাশ্মীরের গেজেটিয়ার এবং লেখক সি. ই. বিটস সারদা মন্দিরে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, মন্দিরটি মধুমতী নদীর তীরে অবস্থিত। মন্দিরে পৌঁছতে হলে একটি ৯ ফুট চওড়া সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। সিঁড়িতে মোট ৬৩টি ধাপ এবং দু'পাশে সুবিশাল রেলিং। মন্দিরের প্রবেশদ্বারটির শীর্ষে একেবারের আধুনিক কায়দার গাড়িবারান্দা। চারদিকের দেওয়াল উচ্চতায় ৩০ ফুট। উত্তর দিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি শিবলিঙ্গ। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪ ফুট উঁচুতে মন্দিরের চাতাল। মন্দিরের ভিতরটি বর্গক্ষেত্রাকার এবং সমতল। কিন্তু পাথরের মেঝে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে অসমতল। কারনাহের রাজা মনজুর খান গুপ্তধনের সন্ধানে খননকার্য চালিয়েছিলেন বলে এই দশা। সেই সময় হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই মন্দিরে যাওয়া-আসা করতেন। আরও একটি বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। ডোগরা রাজারা মন্দিরের নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্গনির্মাণ করেছিলেন। ৬০ জন সিপাহি সদাসর্বদা দুর্গে মোতায়েন থাকত। মূল মন্দিরটি ছিল দুর্গের ৪০০ গজ দক্ষিণে। মন্দিরের বিগ্রহ সম্বন্ধে বিটস সাহেব কিছু লেখেননি।

প্রাচীন যুগে সারদাপীঠ সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল। এখনও পর্যন্ত যা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় সম্রাট অশোক (২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মন্দিরের অনতিদূরে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করিয়েছিলেন। সারদাপীঠের নামেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল বুদ্ধের শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার। ১৪১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনিষ্ক সারদাগ্রামে চতুর্থ বিশ্ব বৌদ্ধ মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সেই সময় থেকে এই অঞ্চল ভারতের বাইরেও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ক্রমশ সারদা গ্রাম বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অঞ্চলের ভাষাও সেই সময় সারদা নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সারদা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে সারদা ভাষায় লেখা একটি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পান। এই পুঁথি থেকে জানা যায় সারদা ভাষা ছিল সেই সময়ে এখানকার প্রধান কথ্য ভাষা এবং এই ভাষায় প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত কাশ্মীর, হিমাচল, তিব্বত এবং নেপালে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের পতনের পর সারদা পীঠের গরিমা ক্ষুণ্ণ হলেও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। মহারাজা রণজিৎ সিংহ এবং ডোগরা রাজা মহারাজ গুলাব সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুরা, বিশেষ করে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা প্রতি বছর দেবীর স্নানযাত্রায় এবং তর্পণে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু ১৯৪৮-র ভারত-পাক যুদ্ধ এবং পাকিস্তানের অন্যায় কাশ্মীর দখলের পর সারদাপীঠের গরিমা বলতে এখন আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই।

একাধিক ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ে সারদাপীঠের কথা উল্লেখ করেছেন। একাদশ শতকে ঐতিহাসিক কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে সারদা পীঠের কথা লিখে গেছেন। আরেক ঐতিহাসিক বেলহন তাঁর বিখ্যাত বিক্রম চিরিতর গ্রন্থে লিখেছেন, সারদাদেবীর আশীর্বাদ না পেলে তিনি শিক্ষালাভ করতে পারতেন না। সারদাদেবীর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, সারদাদেবীর মুকুটটি ছিল সোনার তৈরি। দেবীর মুকুটসহ যাবতীয় আভরণ তৈরি হয়েছিল মধুমতী নদী থেকে সংগৃহীত সোনায়। আলবেরুনি ভারতে এসেছিলেন ১০৩৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সারদাদেবীর সুবিশাল মূর্তি এবং অসংখ্য ভক্তসমাগমের কথা লিখেছেন। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে মুজফ্ফরাবাদের দ্রাভা অঞ্চলে একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের কথা লিখেছেন, যে মন্দিরে অধিষ্ঠান করেন দেবী সারদা। প্রত্যেক মাসে শুক্ল পক্ষের দিন দেবী নানারকম অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন। আবুল ফজল স্বয়ং দেবীর এহেন লীলাবিলাসের সাক্ষী ছিলেন বলে জানা যায়। কাশ্মীরের সুলতান জইন-আল-আব-দিনের রাজসভায় অন্যতম সদস্য ছিলেন তৎকালীন (১৪২০-১৪৭২ খ্রিস্টাব্দ) লেখক জুনা রাজ। তিনি লিখেছেন, সুলতান জইন-আল-আব দিন সারদাদেবীর ভক্ত ছিলেন এবং হিন্দুদের নানা আচার-অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ১৪২২ সালে তিনি স্নানযাত্রায় অংশ নেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিল দেবীর অলৌকিক মহিমা নিজের চোখে দেখবেন। কিন্তু রাতে ঘুমিয়ে পড়ায় তাঁর সাধ পূর্ণ হয়নি।

বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা লিখে গেছেন সারদাপীঠ এক সময় এই উপমহাদেশে বিখ্যাত ছিল। তাঁদের লেখা থেকে জানা যায় বৌদ্ধরা এখানে আসার অনেক আগে থেকেই মূলত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পরিচালনায় এই অঞ্চল সংস্কৃত পঠনপাঠনের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। ১২৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিখ্যাত জৈন ইতিহাসগ্রন্থ প্রভাচরিত থেকে জানা যায়, সে যুগের প্রথিতযশা জৈন (শ্বেতাম্বর) পণ্ডিত হেমচন্দ্র তাঁর ব্যাকরণগ্রন্থ সিদ্ধহেমা রচনা করার সময় সারদাপীঠের বৈয়াকরণদের সাহায্য নিয়েছিলেন। বৈষ্ণব সন্ত রামানুজাচার্য সুদূর শ্রীরঙ্গম থেকে সারদাপীঠে এসেছিলেন এখানে সংরক্ষিত বৌধায়নের ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করবেন বলে। তিনি তখন ব্রহ্মসূত্রের টীকা শ্রীভাষ্য রচনা করছিলেন। তাঁর রচনা থেকে জানা যায় মন্দিরের অনতিদূরে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

তারপর মধুমতী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। আজ দেবী সারদা শুধু নিঃসঙ্গ নন, পরিত্যক্ত বলা চলে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ এবং ৪৮-এর যুদ্ধের ফলে সারদাপীঠ এখন পাকিস্তানের দখলে। ৬২ বছর মন্দিরের দরজা খোলা হয়নি। প্রদীপ জ্বালেনি কেউ। শোনা যায়নি ঘণ্টাধ্বনি। তবুও দেবী আছেন। তাঁর মহিমা আছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা লড়াই করছেন। তাঁরা দেবীকে দর্শন করতে চান। স্নানযাত্রা শুরু করতে চান। তাঁরা সফল হলে মন্দিরের দরজা খুলবে। নয়তো লড়াই চলবে। অনন্তকাল ধরে চলবে। ভারত কিছুতেই তার শক্তির ভরকেন্দ্র অর্বাচীনদের হাতে নষ্ট হতে দেবে না। ■

ভক্তবৎসলা মা আনন্দময়ী

রূপশ্রী দত্ত

মা আনন্দময়ীর পূর্বনাম নির্মলাসুন্দরী। তিনি ধরাধামে এসেছিলেন ১৮৯৩ সালের ৩০ এপ্রিল। আর মহাপ্রস্থান করেন ১৯৮২ সালের ২৭ আগস্ট। তাঁর পিতার নাম বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য ও মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী। অধুনা বাংলাদেশের খেওড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে তাঁর জন্ম। পিতা বিপিনবিহারী ছিলেন ভ্রাম্যমাণ ভক্তিগীতিগায়ক। ১৩ বছর বয়সে তখনকার গ্রাম্য প্রথানুযায়ী, বিক্রমপুরের রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে নির্মলার বিবাহ হয়। পরে রমণীমোহনের মধ্যেও নানা আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ হয় এবং তিনি বাবা ভোলানাথ নামে ভক্তসমক্ষে পরিচিত হন।

নির্মলা বিবাহের পর ভাসুরের গৃহে থাকতেন। নববধূর ধ্যান, সমাধি, কর্মরত অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানবিলুপ্তির জন্য লোকে তাঁকে মানসিক ভারসাম্যহীন ভাবত। প্রতিবেশী হরকুমার চক্রবর্তী একমাত্র সেই সময় নির্মলার মর্ম উপলব্ধি করেন। তিনিই প্রথম সমাগত জনকে শেখান নির্মলাকে মাতৃ-সম্বোধনে 'মা' ডাকতে।

অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর হয়ে নির্মলা শাহবাগে যান। সেখানে রমণীমোহন ঢাকার নবাবের উদ্যানরক্ষক হিসেবে কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। নির্মলাসুন্দরীর সর্বপ্রথম শিষ্য জ্যোতিষচন্দ্র রায় (ভাইজী) প্রথম তাঁকে 'মা আনন্দময়ী' বলে অভিহিত করেন। তখন থেকেই মা আনন্দময়ী তাঁর আধ্যাত্মিক বাণী, জীবনদর্শন ইত্যাদির দ্বারা সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেন। ধ্যানের মধ্য দিয়েই নানা মন্ত্রোচ্চারণ যোগক্রিয়া ইত্যাদি তাঁর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হোত।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, ত্রিগুণাচরণ সেন মাতৃচরণাশ্রিত ছিলেন। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী মা আনন্দময়ীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মা নানা অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমেও ভক্তহৃদয়ে গভীর ছায়াপাত করেছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বলেছেন— তাঁদের বিভিন্ন ইষ্টদেব দেবীকে তাঁরা মায়ের মধ্যে দর্শন করেছেন। মায়ের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে নারায়ণানন্দ তীর্থ, গুরুপ্রিয়াদিদি— তাঁর কাছের মানুষ ছিলেন। ভক্তেরা মাকে তাঁদের গৃহে নিয়ে যেতে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু মা গৃহীর গৃহে রাত্রিবাস করতেন না। সেজন্য তাঁর জন্য পৃথকভাবে নির্মিত বন্দোবস্ত ভক্তদের গৃহে থাকত। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত কথা প্রসঙ্গক্রমে জানাই। আনন্দময়ী মা আমাদেরও পারিবারিক আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। একদিন বিকেলে আমরা একটু স্থানান্তরে গিয়েছিলাম। তখন মোবাইলের যুগ নয়। তাই মায়ের পার্ষদরা কোনো খবর দিতে পারেননি। আমরা এসে অবাক বিস্ময়ে দেখি, মা সপার্ষদে, ঠাকুরবাড়ির রোয়াকে বসে আছেন। করুণাময়ী মা আমাদের পুলকিত বিস্ময়ের মুখোমুখি করেছিলেন। মায়ের ভোগ রান্নার জন্য গঙ্গাজল প্রয়োজন ছিল। সে সময় আমাদের ঠাকুরঘরে গঙ্গাজল কিছুটা কম ছিল। গুরুপ্রিয়াদি সমাধান করে দিলেন। বাড়ির সংলগ্ন গাছ থেকে ডাব পাড়িয়ে, সেই জলই গঙ্গাজলের বিকল্প হতে পারে। অতঃপর তাতেই রান্না হয়েছিল মায়ের জন্য মোহনভোগ এবং তা বিতরণ করা হয়েছিল সমাগত ভক্তজনের মধ্যে। পরদিন থেকে মাতৃআগমনের সংবাদ লোকমুখে প্রচার ও দলে দলে নানাজনের আগমন। মায়ের চরণস্পর্শ করা নিষেধ ছিল। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করাই নিয়ম ছিল। মায়ের কণ্ঠে এক কলি গান ও সমাগত ভক্তদের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া সেই ভক্তিগীতি আজও কানে বাজে। মনে পড়ে মায়ের অমূল্য বাণী— 'হরি কথাই কথা / আর সব বৃথা ব্যথা। ■

ইতিহাসের গল্প

বিষ্ণুপুরের রানি চন্দ্রপ্রভা

খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে বিষ্ণুপুরে মল্ল রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষানুক্রমে মল্লরাজদের বীরত্বের খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ে। এই বংশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাজা বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে। তখন থেকেই মদনমোহন বিষ্ণুপুরের উপাস্য দেবতা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায় চলছে তখন। দিল্লীতে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজের সারা হিন্দুস্থান থেকে হিন্দু শেষ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। দিকে দিকে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। হিন্দুশক্তি ভারত জুড়ে যেন গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। ইসলামি শাসকদের দিন যে শেষ দেওয়াল লিখন তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণুপুরেও বীর হাম্বির-পুত্র রঘুনাথ সিং সিংহাসনে বসেছেন। তিনি যেমন বীর, তেমনি ধার্মিক। তাঁর আমলে শ্যাম রায়, জোড়া বাংলা মন্দির নির্মিত হয়। সেই সময় চন্দ্রকোণার ক্ষুদ্র ভূস্বামী শোভা সিংহ মুঘলদের আধিপত্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক অঞ্চল জয় করতে থাকেন। বাংলার সুবেদার পর্যন্ত তাঁর সামনে দাঁড়াতে দু-বার ভাবতো। হুগলীর ফৌজদার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। এমনই এক সময় কূটনীতির চালে মুঘল শাসক রঘুনাথ সিংকে শোভা সিংহের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। এটা মুঘলদের চিরাচরিত কূটনীতি। কারণ এই যুদ্ধে যে দলেরই হার হোক, আখেরে ক্ষতি হবে হিন্দুশক্তির। এবারও তারা সাফল্য পায়। মল্লরাজের কাছে শোভা সিংহ পরাজিত হন। ধ্বংস হয় তাঁর সৈন্য-সামন্ত। হুগলীর দুর্গ জয় করেন রঘুনাথ সিং। বিষ্ণুপুরে বেজে ওঠে বিজয় শঙ্খ। রানি চন্দ্রপ্রভা বিজয়ী রাজার অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত। অপেক্ষমাণ চন্দ্রপ্রভা দুর্গদ্বারে তোপধ্বনি ও দামামার শব্দ শুনে জয়তিলক পরানোর জন্য এগিয়ে এলেন, কিন্তু রাজা রাজমহলে এলেন না। তিনি লালবাঈ নামে এক প্রমোদ সহচরীকে নিয়ে আমোদে মাতলেন। রানি একেই নিজ ভবিতব্য মনে করে পূজাপাঠে মন দিলেন। একদিন তিনি শুনলেন রাজা লালবাঈয়ের কথায় রাজমহলের মন্দিরে পূজাপাঠ নিষিদ্ধ করেছেন। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর খবর এল একদিন—রাজা নাকি নিজধর্ম বিসর্জন দিয়ে ইসলাম কবুল করবেন। রানি চুপ থাকতে পারলেন না। সংকল্প স্থির করে মন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে নিভৃতে পরামর্শ করলেন। শেষে বিষ্ণুপুরের সম্মান ও ধর্ম রক্ষার জন্য মন্ত্রীকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। রাজা নিহত হলেন। চিতায় শায়িত রাজাকে দেখে অনেকেই ভাবলেন, কী কঠোর রানির হৃদয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের ধর্মরক্ষার আর কি কোনো উপায় ছিল! চিতায় অগ্নি সংযোগের সময় দেখা গেল, নববধূ বেশে রানি চন্দ্রপ্রভা সহমরণে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। তিনি চিৎকার করে বলেন, 'স্বামীঘাতিনী হলেও স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবার অধিকার আমার আছে'। সব বাধা উপেক্ষা করে তিনি জ্বলন্ত চিতায় সঁপে দিলেন নিজ প্রাণ। কঠোর ভাবে কর্তব্য সম্পাদন করে রাজ্যরক্ষার চরম নিদর্শন রেখে সহমৃতা হলেন রানি চন্দ্রপ্রভা।

প্রণয় রায়

প্রেরণা

ভীমরাও

সকাল থেকেই কালো মেঘে আকাশ মুখ ভার করে আছে। এখনি হয়তো আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে। ছোট্ট ভীমরাওয়ের খুব চিন্তা হলো তাহলে কী আজ স্কুলে যাওয়া হবে না! কিন্তু ভীমরাও তো একদিনও স্কুল

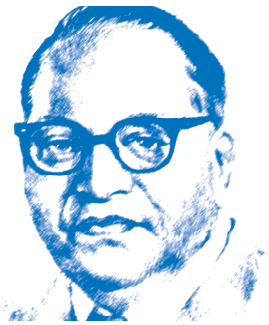

কামাই করে না। আজ একটু বৃষ্টি আসবে সে স্কুলে যাবে না তা কী করে হয়! হাতে বইপত্র নিয়ে সে স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ল। ভীমরাওরা অনেক ভাই-বোন। ভীমরাওয়ের বাবা তাকে পড়াশুনায় খুব উৎসাহ দিতেন। তাই সে মন দিয়ে তার পড়াশুনা করত। আজ বৃষ্টি আসবে ভেবেও সে স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। সঙ্গে অন্য ছাত্ররাও যাচ্ছে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমে এলো। সঙ্গে অন্য যে ছাত্ররা ছিল তারা বাড়ির দিকে দিল ছুট। ভীমরাও কিন্তু তা করল না। সে স্কুলের দিকে চললো। বৃষ্টিতে সারা শরীর, জামা ভিজে যেতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে পড়ল বইগুলোও তো ভিজে যাচ্ছে। তখন কোনোরকমে সেই বইগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগলো। কারণ এই বইগুলোই ছিল তার প্রাণ।

প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া, বই প্রেমী এই ভীমরাও বড় হয়ে পরিচিত হন বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর নামে। তিনি ভারতের সংবিধান প্রণয়নের অন্যতম পুরোধা পুরুষ।

রণি চট্টরাজ

রাজ্য পরিচিতি

জম্মু-কাশ্মীর

জম্মু-কাশ্মীর ভারতের একেবারে উত্তর প্রান্তে। এই রাজ্যকে পৃথিবীর ভু-স্বর্গ বলা হয়। পাকিস্তান এই রাজ্যের ৭৮ হাজার ১১৪ বর্গকিলোমিটার দখল করে রেখেছে ও চীনকে দিয়েছে ৫ হাজার ১৮০ বর্গকিলোমিটার এবং চীন দখল করে রেখেছে ৩৭ হাজার ৫৫৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা। বর্তমানে আয়তন ২ লক্ষ ২২ হাজার ২৩৬ বর্গকিলোমিটার। সরকারি ভাষা উর্দু। জনসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৩০২ জন। রাজধানী শীতকালে জম্মু এবং গরমকালে শ্রীনগর। বিভিন্ন রকম ফল এবং কেশর প্রধান ফসল। বৈষ্ণবদেবী, অমরনাথ গুহামন্দির, আদি শঙ্করাচার্য মন্দির, ক্ষীরভবানী, রঘুনাথ মন্দির প্রধান তীর্থক্ষেত্র।

এসো সংস্কৃত শিখি

মহান্ আনন্দঃ।

ভীষণ আনন্দ/দারুণ মজা।

তথা ন।

তা নয়।

তস্য কঃ অর্থঃ ?

তার মানে/অর্থাৎ?

আম্.....।

হ্যাঁ।

এবমেব.....।

এরকমই।

ভালো কথা

রানি

রোজ সকালে প্রায় পৌনে ছটায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন আমার মা বাবা কেউ ওঠে না। আমি রোজ সকালে আগ্রহসহকারে শাখায় যাই খেলার জন্য। কিন্তু মাঠ যতই কাছে হোক না কেন, আমাকে মাকে জোর করে তুলতেই হয়। আমি গাড়ি-ঘোড়া থেকে ভয় পাই না। ভয় পাই আমাদের বাড়ির নীচে থাকা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দারোয়ানকে। তার নাম রানি। রানি খুব ডেঞ্জারাস। যার পিছনে লাগে তাকে আর ছাড়ে না। রানি আমাকে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে। আমি ভয় পেয়ে দৌড়লে আমার পিছনে ছুটতে থাকে। আমি অনেকবার ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছি কিন্তু সাহস পাইনি। আমি চাই ওকে নিজের প্রিয় বন্ধু করতে। তাই একদিন যখন রানি আমার দিকে তেড়ে আসছিল, আমি ভয় পেলেও দু'টি বিস্কুট ছুড়ে দিই। রানি লেজ নাড়তে নাড়তে খেতে থাকে। তারপর থেকে রানি আর আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে না আর তেড়েও আসে না। এখন ও আমার প্রিয় বন্ধু।

মৌনব দাস, ষষ্ঠ শ্রেণী, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

শীতের দেখা নাই

রাহুলদেব বর্মন, অষ্টম শ্রেণী

শরৎকালে শিশির পড়ে
হেমন্ততে হিম
সকালবেলায় শীতের আমেজ
রাতে লেপে ঘুম।
এবার নাকি তা হবে না
শীত যে বহুদূর

টিভি চ্যানেল খবরের কাগজ
সবারই এক সুর।
এ সময় সবারই যে
শীতের পোশাক চাই
হা-পিত্যেশে বসে থাকা
শীতের দেখা নাই।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ -
7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধি মেয়েদের পক্ষে অশনি সংকেত

অঙ্গনা

শুভশ্রী দাস

আজকাল একটি দৃশ্য প্রায়ই সবার চোখে পড়ছে। কলেজ- ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েরা ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে প্রকাশ্যে সিগারেট টানতে টানতে চলেছে। কখনো বা কোনো স্থানে বাইকে করে এসে জোড়ায় জোড়ায় বসে একটি সিগারেটই পালা করে সবাই টানছে। কয়েক বছর আগেও এ দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়তো না। এসব দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, সিগারেটের প্রতি মেয়েদের এত আকর্ষণ বাড়ছে কেন? একটি সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, শুধু সিগারেট, হুকো বা মদই নয়, ভাং-গাঁজার মতো নেশায় মেয়েরা সহজেই আসক্ত হয়ে পড়ছে। গত পাঁচ-ছয় বছরে ধূমপায়ী মেয়েদের সংখ্যা ১৫ শতাংশ বেড়েছে। গত বছর দিল্লীর বড় দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমীক্ষার রিপোর্ট পিলে চমকে দেওয়ার মতো। দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশ ছাত্রী সিগারেটে আসক্ত।

বড় বড় শহরের অভিভাবকদের চোখে এ দৃশ্য না পড়ার কথা নয়। গ্রামের অভিভাবক যাঁদের মেয়ে বড় বড় শহরে পড়তে এসেছে তাঁরা কিন্তু এ দৃশ্য অনুমান করতে পারবেন না। বর্তমানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার চেতনা বেড়েছে। তাদের অভিভাবকরা মেয়েদের প্রগতিশীল হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। আর এটা কাম্যও। কিন্তু এই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগও পথেঘাটে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবিষয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে উত্তর পাওয়া যায়, 'আমরা ছেলেদের থেকে কম কীসে। তারা যদি সিগারেট খেতে পারে আমরা পারব না কেন'! এসব শোনার পর মনে হয় সিগারেট খাওয়াটা আজ মেয়েদের কাছে প্রগতিশীলতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমার জানা বহু উচ্চশিক্ষিতা— স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কর্মরতা মহিলা, তারা কেউই ছাত্রীজবনে কোনো নেশায় আসক্ত হননি।

এখন মেয়েদের পড়াশোনার জন্য, চাকরির জন্য বাইরে থাকতে হয়। তাতে কখনো কখনো অভিভাবকদের নজরদারি থাকে না, দেখাশোনার, সতর্ক করার কেউ থাকেন না। এরকম অবস্থায় নিজের ইচ্ছামতো চলার জেদ বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় ভালো মেয়ে যারা নিজের যোগ্যতা ও অস্তিত্ব প্রমাণের ঝোঁকে স্বাধীনতার নামে সংস্কারের 'বন্ধন' ভেঙে নেশাকে জীবনের অঙ্গ করে নিচ্ছে। স্রেফ সময় কাটানোর জন্য শুরু করে, তাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। সম্প্রতি কলকাতা এসেছিলেন মুম্বইয়ের ড. সায়লী কুলকার্নি। তিনি বেশ কয়েকবছর ধরে তাঁর জ্ঞানেশ্বরী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'তামাক মুক্ত মহারাষ্ট্র অভিযান' চালাচ্ছেন। তিনি জানালেন, অভিযান চালানোর সময় বহু ছাত্রী যুবতী ও মহিলার সঙ্গে কথা হয়। তাতে জানা যায়, স্বাধীনতার ভুল ব্যবহার, অভিভাবকদের উদাসীনতা, বাড়িতে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা কম হওয়া, নেশাগ্রস্ত বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গ, কম বয়সে বেশি টাকা হাতে আসা, সামাজিক শৃঙ্খলার অভাব, প্রশাসনিক উদাসীনতা ইত্যাদি কারণে মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল ও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

২০১২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা (হু) একটি সমীক্ষা করে। তাতে দেখা যায়, বিশ্বে ১০০ কোটি ধূমপানকারীর মধ্যে ২০ কোটি মহিলা। পুরুষ ও মহিলা আলাদা আলাদা কারণে নেশাগ্রস্ত হয় এবং আলাদা আলাদা কারণে তা ছেড়ে দেয়।

এটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষরা মানসিক উত্তেজনা (টেনশন) হেতু ধূমপান করে। কিন্তু মহিলা বিশেষ করে যুবতীরা নেতিবাচক ভাবনায় ধূমপান শুরু করে আসক্ত হয়ে পড়ে। দেখা গিয়েছে, ৫৬ শতাংশ পুরুষ তাদের বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার সময় ধূমপান করে। মেয়েরা প্রকাশ্যে, রাস্তায়, অফিস ক্যাম্পাসে, ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ধূমপান করে। অর্থাৎ মেয়েরা বোঝাতে চায় ছেলেদের থেকে তারা কম নয়। এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এটি একটি জাতির পক্ষে অশনি সংকেত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সতর্কবার্তা— 'রক্তে নিকোটিনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হয়।'

ভারতীয় ভাবনায় নারীজাতি অনন্তশক্তির অধিকারিণী। পাশ্চাত্য ভাবনায় স্ত্রীজাতি দুর্বল। বিশ্বায়ন এবং ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় নারী আজ পণ্যমনস্ক ইঁদুরদৌড়ের শিকার হয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। যোগ্য হতে হয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে; নেতিবাচক নয়। খুব দেরি হয়ে যায়নি, কিন্তু এখনই মেয়েদের এই কু-ব্যসন থেকে মুক্ত করতে না পারলে সত্যিই খুব দেরি হয়ে হয়ে যাবে। ■

‘আপ’-কে নিয়ে স্বপ্নভঙ্গ কী শিখলাম আমরা

অতিথি কলম

চেতন ভগত

চেতন ভগৎ

দিল্লীর পড়ুয়াদের বিদ্যালয়গুলি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা হলো। সমস্ত রকমের নির্মাণকার্য ১০ দিনের জন্য স্থগিত। রাস্তায় নাকি কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের কথা ভাবা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দিল্লীবাসীকে ঘরবন্দি হয়ে থাকতে বলছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দিল্লীকে ‘গ্যাস চেম্বারের’ সঙ্গে তুলনা করেছেন। গত ১০ দিন ধরে দিল্লীর বাতাস, কুয়াশা, ধোঁয়া, ডিজেলের গ্যাস, ধুলো ইত্যাদি মানুষের সুস্থ নিঃশ্বাস নেওয়ার পক্ষে হানিকর নানান বিষাক্ত বস্তুতে ধীরে ধীরে ভরে উঠেছে। আজ তা নিয়ন্ত্রণের সীমা অতিক্রম করার প্রান্তে। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল তাঁর চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা বা নাগরিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে আপৎকালীন ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা না ভেবে এতদিন লাগোয়া রাজ্য হরিয়ানা, পঞ্জাবের চাষিদের খড় জ্বালানোকে এই বিষবাষ্প

‘আপ’ পার্টি যখন রাস্তায় আন্দোলন করছিল তাদের মূল কথাই ছিল ভোগবিলাস পরিহার আর রাজ্যের অপচয়মূলক খরচ বন্ধ করা। হায়! ক্ষমতায় এসে তারাই প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করে মহার্ঘ বিদেশি মদ চাখতে চায়। এরা অল্প সময়েই প্রমাণ করে দিয়েছে জাতীয় কোষাগার লুট করতে এরা কুণ্ঠিত হবে না।

ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী করছিলেন। সদ্য রাজধানীর কেজরিওয়াল কথিত গ্যাস চেম্বারে এসে নেমেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেজা মে। তাঁকে এই দূষিত বাষ্পের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই কেন্দ্রীয় সরকারের বড় দায়িত্ব। কেজরিওয়ালের অবশ্য এনিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তিনি অনুসন্ধান করছেন নতুন কার ওপর দোষারোপ করে নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে লাঘব করা যায়। ইতিমধ্যে পুণ্যার্থীদের পুজো-অর্চনায় বাধা দিয়ে হৈ হল্লা সৃষ্টি করে আবার এক আপ বিধায়ক বিটুরাজ গোবিন্দ সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছেন। সর্বশেষ এই গ্রেপ্তারি ঘটনা নিয়ে আপ বিধায়কদের আইন ভাঙা, মারপিট বাঁধানো, নাগরিকদের ওপর নির্যাতন চালানো, জাল শংসাপত্র জমা দেওয়া, অসাংবিধানিকভাবে অর্থ আত্মসাৎ করা থেকে অন্যায় ক্ষমতাভোগ, পারিবারিক হিংসা প্রয়োগ ইত্যাকার নানাবিধ কারণে তাদের একটা বড় অংশকে প্রায়শই আইনের শাসন বলবৎ রাখতে গ্রেপ্তার করতে হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিশিষ্ট লেখক শ্রী চেতন ভগৎ একটি মননশীল বিশ্লেষণ করেছেন, সেটি তুলে দেওয়া হলো।
—সম্পাদক

চটজলদি কেউ যদি অনলাইনে একবার চেক করে নেন তাহলে দেখতে পাবেন দিল্লী থেকে ইকনমি ক্লাসে একটি রিটার্ন টিকিট কাটতে খরচ পড়ে ৪৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে বিজনেস ক্লাসের টিকিট কাটলে সেখানে ভাল শয্যা, বসার লাউনজ ও বিদেশি মদ সরবরাহ সমেত খরচ ধরা হয় ২ লক্ষ টাকা। যতদূর খবর পেয়েছি, এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর টিকিটে প্রাপ্ত সুবিধেগুলিও দিল্লীর এক ‘আপ’ মন্ত্রীকে খুশি করতে পারেনি। তাই তিনি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করাই মনস্থ করেন। এতে বিলেত যাওয়ার খরচ পড়েছে আকাশছোঁয়া— চার লক্ষ টাকা। হ্যাঁ, এটা ঠিকই মন্ত্রীরা নিজেরা কখনই এই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন না। তাঁরা এই খরচের বোঝা সরকারের ওপর ছেড়ে দেন। সরকার অবশ্য করদাতাদের কাছ থেকেই শেষমেষ এই টাকা আদায় করে ছাড়ে। এই ধরনের ভ্রমণের উদ্দেশ্যগুলি সাধারণত খুবই ধোঁয়াশায় ভরা। লন্ডন ছাড়াও (ব্রাজিল, ফিনল্যান্ড ও অন্য দেশও ছিল) ভ্রমণের অ্যাজেন্ডায় ছিল এলোপাথাড়ি কিছু নির্দিষ্ট বিষয়হীন সেমিনার, কিছু ছাত্রদলের সঙ্গে সঙ্গে নাম কা ওয়াস্তে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। এমন যে কোনো তুচ্ছ ছুতোয় আমার ধারণায় বিশ্বের অন্যতম নিকৃষ্ট দূষিত শহর দিল্লী ছেড়ে অন্তত কিছুদিনের জন্য কেটে পড়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ অবশ্যই তুলনামূলকভাবে আরামপ্রদ। এতে চার

ফঃ ৪

ইঞ্চির মতো বাড়তি জায়গা অধিকার করা যায়। পায়ের আরামের জন্য আরও বাড়তি স্থান অধিকারে থাকে। অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেরা মদ বাছাইয়ের সুযোগও অনেকটা বাড়ে। আর এখানে একান্তে বিলাসী হওয়ার অবকাশও নিরুদ্বেগ। বড় কোম্পানির সিইও-রা বিজনেস ক্লাসে ভ্রমণ করে থাকেন। প্রথম শ্রেণীটা সাধারণত মিলিওনিয়ার বা বিলিওনিয়ার, প্রতিষ্ঠিত চিত্রতারকা আর অবশ্যই মন্ত্রীসভার শপথ নেওয়ার সময় 'Take Metro' সদলে দিল্লী মেট্রোর ধরে মন্ত্রণালয়ে যাবে বলে অঙ্গীকার করা 'আপদলের' মন্ত্রী বিধায়কদের জন্যই সংরক্ষিত।

এগুলো শুনতে বেশ মজাই লাগত যদি না বাস্তবে এটা ঘটে যেত। এই দলটি কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই রাস্তার রাজনীতি করে ক্ষমতায় এসেছে। এদের সমর্থন করেছে কোনো ভুয়ো ভোটার নয়, খাঁটি ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী যার সঙ্গে জুড়ে ছিল আপের ওপর তাদের অগাধ আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমরা ভারতীয়রা এইবার রুখে দাঁড়িয়েছিলাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, হটিয়ে দিয়েছিলাম একটি আদ্যন্ত কেলেঙ্কারিতে কলঙ্কিত সরকারকে, তার জায়গায় সমর্থন করেছিলাম একটি আনকোরা নতুন দলকে। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম এরা আমাদের কথা ভাববে। কেননা আপ দলটি জন্মলগ্ন থেকেই এটা তুলে ধরার চেষ্টা করছিল যে সাধাসিধে জীবনযাত্রাই একটা বড় গুণ। আর সেই দলই একটি গরিব দেশের টাকা উড়িয়ে ছলচাতুরিপূর্ণ কিছু মিটিংয়ের অছিলায় অকাতরে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করার মতো হীন কাজ করছে। আর এই দলের প্রধান সব দেখছেন। যদিও যে কেউই তাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করলে তিনি যে ধোয়া তুলসীপাতা তা প্রমাণের জন্য অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করতে সদা তৎপর। আপের নানান ফন্দিফিকির ও শয়তানিভরা আচরণ দেশে আজকাল আর কোনো আমোদের উদ্রেক করে না। বাস্তবে আজ ভারতীয় রাজনীতির অত্যন্ত বিষাদময় দিন। কেননা আপ দলকে ঘিরে স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। মানুষের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা হৃদয়বিদারক। এই বিষয়ে আলোচনা করতেও অস্বস্তি হয়। সব দেখেশুনে মনে হয় দোষ শুধু কংগ্রেসেরই নয়। বলতে খারাপ লাগলেও সত্যি যে জাতিগতভাবে আমরা একদল চোর, ঠক, মিথ্যেবাদী ও লুটেরার বাহিনী। এরকম চলছে তো চলছেই, ওপর থেকে খুব সাধু মনে হয় কিন্তু শুধু সুযোগের অপেক্ষা। সুযোগ পেলেই শিকারি বেড়ালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। মনে করে দেখুন, এই 'আপ' যখন রাস্তায় আন্দোলন করছিল তাদের মূল কথাই ছিল ভোগবিলাস পরিহার আর রাজ্যের অপচয়মূলক খরচ বন্ধ করা। হায়! ক্ষমতায় এসেই এরা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করে মহার্ঘ বিদেশি মদ চাখতে চায়। এরা অল্প সময়েই প্রমাণ করে দিয়েছে জাতীয় কোষাগার লুট করতে এরা কখনই কুণ্ঠিত হবে না। তারা চিন্তিত ছিল একটাই কারণে যে কেন তারা এতদিন লুটমার করার সুযোগটা পায়নি। আজ তারা হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছে। পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু আপ মন্ত্রী দুর্নীতি, ধর্ষণ বা ডিগ্রি জাল করার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে মুখ পুড়িয়েছেন। সর্বশেষ এভাবে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল টাকা অন্যায় ভাবে খরচ করা প্রমাণ করল আপ সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অন্যান্য আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের থেকেও 'আপ' হয়তো সব থেকে বেশি নোংরা একটি দল।

বোঝা দরকার কোথায় ভুল হয়েছিল। কেন ন্যায়কামী ভারতীয়দের স্বপ্ন এভাবে ভেঙে পড়ল? আর সবচেয়ে জরুরি এ থেকে আমরা কী শিখলাম? প্রথম আমরা 'আপকে' সৃষ্টি করেছিলাম এমন একটা সময়ে যখন আমরা পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি নিয়ে বীতশ্রদ্ধ ছিলাম। আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল দলের মাথায় যদি এমন একটা মুখ থাকে যাকে বিশ্বাস করা যায় তাহলে দলটা কখনই চোরের দল হবে না। আমাদের বিরাট ভুল হয়েছিল, নীতিশিক্ষাটি এই যে দুর্নীতিবাজকে শায়েস্তা করতে গেলে সরকারের জবাবদিহি করার বাধ্যবাধকতা অনেক বাড়াতে হবে। কেবল সেই সরকারকে বদল করে বা নতুন দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে ফল পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত, আপ বিজয়ী হওয়ার জন্য সবকিছু বাজি রেখেছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনে তারা প্রার্থীর ক্ষেত্রে শুধু বিচার করেছিল যে জিততে পারবে কিনা। আপের যে প্রধান সম্পদ তাদের দলের ছত্রছায়ায় থাকলে, তাদের নাম ব্যবহার করলে সমাজের ভালো মানুষরা জিতে আসতে পারবে। এই তকমাটা আর তাদের নেই। আপ তা খুইয়েছে। বাস্তবে সৎ, নীতিনিষ্ঠ মানুষদের আপ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল লুটেরা, গুণ্ডা, দাগি, ধর্ষক, জোচ্চোর যারা ভোট জোগাড় করতে পারবে শুধু তাদেরই আমন্ত্রণ করা হয়েছে। অবশ্য ততদিনই তারা থাকবে যতদিন ভোট জোটাতে পারবে। হ্যাঁ, আপ ভোটে জিতেছিল কিন্তু তাদের দলীয় আন্তরিকতা, নীতি ও সততা সবই তারা হারিয়েছে। মনে রাখতে হবে, একবার নদী দূষণযুক্ত হয়ে গেলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া, পরিচ্ছন্ন করা খুবই শক্ত। স্মরণ করুন কীভাবে Apple, Google ছেড়ে লোকজন 'আপে' যোগ দিয়েছিল। গত এক বছরে কী আর তেমন কাউকে যোগ দিতে দেখা গেছে? একটি সংগঠনের মূল নৈতিকতার সঙ্গে কখনই আপোশ করা যায় না তাতে দলের বৃদ্ধি হয়ত একটু শ্লথ হলেও হতে পারে।

তবে, এটাও বলা যায় --- আমরা ভারতীয়রা আশা ছাড়ব না। আপ আমাদের হঠাৎ একটা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু পরিণামে হয়ত তেতো সত্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তবে তার মানে কখনই এই নয় যে এদেশে কখনই কোনো পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না। সেটা বাস্তবায়িত করতে গেলে সরকারের দায়বদ্ধতা নির্দিষ্ট করতেই হবে। নজরদারি বাড়াতে হবে। তবে সব নজরদারি প্রধানমন্ত্রীকে অকারণ গালি দিয়ে আর বিমানের প্রথম শ্রেণীর আসনে বসে এবং আম আদমি ব্রান্ডের সুরা পান করে হবে না। ■

তিন তালাকের প্রতিবাদ আসছে মুসলমান সমাজের ভেতর থেকেই

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

আজমা খান এখন মুম্বইয়ের এক জুনিয়র কলেজে শিক্ষকতা করেন। বছর দশেক আগে উত্তরপ্রদেশের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে আজমা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল পেশায় ট্যাক্সি চালক শাহনওয়াজ হুসেনের সঙ্গে। হুসেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে ট্যাক্সি চালাতেন। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আজমাকে তালাক দিতে চান। বিয়ের যৌতুক হিসেবে হুসেনের পরিবার একটা গাড়ি দাবি করেছিল। আজমার বাবা গাড়ি দিতে পারেননি, কিন্তু মোটর সাইকেল, সোনা-দানা আর নগদ টাকা দিয়েছিলেন। তাতে হুসেনের পরিবারের মন ভরেনি। —''আমাকে সারাদিন একটা ঘরে আটকে রাখা হোত, কারোও সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হোত না। বাইরের লোকেদের বলা হয়েছিল, আমার না কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে''— কথাগুলো বলতে গিয়ে আজমা চোখের জল ধরে রাখতে পারছিলেন না। চারমাসের গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এত নির্মমভাবে পেটাত যে তাঁর গর্ভপাতের মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। তাতেও মার থামেনি। মেয়ে ইকরা জন্মানোর পর অত্যাচার চরমে ওঠে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছেলে চেয়েছিল। একবার এত ভয়ানকভাবে মারা হয় যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। আজমা যখন সুস্থ হয়ে উঠছিলেন সে সময় স্বামী ফোনে তালাক দেয়। যেখানেই যেতেন শুনতে হোত যে তাঁকে মুসলমান আইনে তালাক দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলমান আইন জানতে একটা আগ্রহের পাশাপাশি তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কেন তাঁর সঙ্গে একজন ভারতীয় নারীর মতো আচরণ করা হবে না। আজমা তাঁর লড়াইকে শুধু আদালত পর্যন্তই নিয়ে যাননি, আইনটাও পড়ে ফেলেছেন। শেষপর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদের খোরপোশ হিসেবে আজমা তাঁর মেয়ের নামে একটা বাড়ি পেয়েছেন। আইনের ডিগ্রি নিয়ে আজ তিনি তাঁর মতো অসহায় মুসলমান মহিলাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

তাঁর পাশের গাঁয়ের ইমরানার সঙ্গে যা হয়েছিল তা শুনলে গায়ের রোম রীতিমতো খাড়া হয়ে ওঠে। একদিন ইমরানা তাঁর শ্বশুরের হাতে ধর্ষিতা হন। মৌলবি সাহেব তাঁকে শ্বশুরের বিবাহিতা স্ত্রী বলে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, মৌলবি তাঁর আসল স্বামীকে তালাক দিয়ে তাকে ছেলে বলে মেনে নিতে বলেন। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ইমরানা ঘটনাটা আদালতের গোচরে আনেন। শ্বশুর আলি মহম্মদের সাজা হয়।

অন্যদিকে অষ্টাদশী তরুণী আরশিয়া মুসলমান মহিলা সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে অচিরেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছেন। বিয়ের দু-বছরের মধ্যেই তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দিয়ে আটমাসের শিশুসন্তানকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। আজমা, ইমরানা বা আরশিয়াদের কাহিনি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং যুগ যুগ ধরে মুসলমান সমাজে মেয়েদের উপর পুরুষদের অত্যাচারের ধারাবাহিক উপন্যাসের ছোট ছোট পরিচ্ছেদ মাত্র!

তিন তালাক ও বহুবিবাহ প্রথার বিরোধিতা করে কেন্দ্র সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ায় মুসলমান সমাজের স্বঘোষিত নেতারা এবার জুজু দেখতে শুরু করেছে। বিজেপির বর্ষীয়ান নেতাদের বিবৃতি এবং অবস্থানের মধ্যে তাঁরা সিঁদুরে মেঘ দেখছে। এ ব্যাপারে তাঁদের অভিযোগ, সরকার ধর্মবিশ্বাস ও সংবিধানে বর্ণিত তাঁদের ব্যক্তি অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। তাঁদের অভিযোগ যে ধোপে টিকবে না সেটা তাঁরা ভালোমতই জানেন। তবুও তালাকের কারবারকে চালিয়ে যাবার জন্য তাঁরা কিছু অর্ধসত্য ও ডাহা মিথ্যাগুলিকেই ফেরি করে চলেছেন।

কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের পথে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড প্রথম সারিতে রয়েছে। মুসলমান মহিলারা যাতে ক্রমাগত লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হতে থাকেন এবং ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন সে ব্যাপারটা তারা সুনিশ্চিত করতে চায়। সেই সঙ্গে তারা এটাও চায় যে

মহিলারা যেন মৌলবি-মোল্লা শাসিত পুরুষসমাজের দয়ায় বেঁচে থাকেন। ল বোর্ড এই কথাগুলো নির্লজ্জভাবে বলতে পারছে না ঠিকই, কিন্তু ইসলামি বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে তারা তালাকের মতো একটা মধ্যযুগীয় প্রথার আইনি স্বীকৃতি জোগাড় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। একাজে তারা একঢিলে দুই পাখি মারতে চায়। একদিকে সমালোচকদের তারা মুসলমান বিরোধী আখ্যা দিচ্ছে, অন্যদিকে ইসলামি ধ্যানধারণার বাইরের লোকেদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বলে গালি দিচ্ছে। মোল্লাদের ভাষণবাজির কারণে অন্ধ আবেগ বেড়ে চলেছে আর তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে। কিন্তু আজকাল প্রতিবাদী কণ্ঠের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় মৌলবাদীরা বিপদ গুনছে। বিভিন্ন নারীবাদী সমাজকর্মী এবং তিন তালাকে ভুক্তভোগী মুসলমান মহিলারা তাঁদের লড়াইকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছেন যাতে করে ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা করা মোল্লাদের সহজে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শুধু বাইরের জগৎ থেকে নয়, মুসলমান সমাজের ভেতর থেকেই এই প্রশ্নটা উঠতে শুরু করেছে যে সামান্য একটা অংশের সমর্থন পাওয়া পার্সোনাল ল বোর্ড গোটা মুসলমান সমাজের হয়ে সিদ্ধান্ত নেবার কে? তাদের সমাজে আজ এত প্রতিবাদ উঠছে যে 'বহিরাগত'রা (পড়ুন বিজেপি-শাসিত সরকার) মুসলমানদের নিজস্ব আইনকে খর্ব করার চক্রান্ত করছে— এই অভিযোগ ধোপে টিকছে না। উচ্চশিক্ষিত মুসলমান মহিলা ও নারীবাদীদের সঙ্গে মিলিতভাবে মুসলমান মহিলা পার্সোনাল ল বোর্ড আজ তিন তালাক ও বহুবিবাহ প্রথা তুলে দেবার দাবি করছে। AIMPLB এতটাই ঘাবড়ে গেছে যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মতো একটি শিক্ষামূলক বিষয়েও তারা ভারতের আইন পর্ষদকে সহযোগিতা করছে না। পার্সোনাল ল বোর্ডের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কামাল ফারুকি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ''আইন পর্ষদের মতলবটা খুব পরিষ্কার। যে ধরনের প্রশ্নমালা তারা তৈরি করেছে তাতে খোলামেলা আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা শরিয়তি আইনে কোনো পরিবর্তন চাই না। এই আইন কোনো মতেই পরিবর্তনযোগ্য নয়। এতে কোনো পরিবর্তনের প্রস্তাব বা সম্ভাবনাকে আমরা গ্রহণ করি না।'' গত ৭ অক্টোবর ভারত সরকারের এক বিবৃতি পার্সোনাল ল বোর্ড এবং মৌলবাদীদের মধ্যে অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলেছে। সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন দাখিল করার সময় সরকারের পক্ষ থেকে তিন তালাক প্রথাকে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে হলফনামা পেশ করে সরকার সোজাসাপটা ভাষায় বলেছে যে, ''তিন তালাক, নিকা হালাল এবং বহুবিবাহ প্রথার যৌক্তিকতাকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ, ন্যায়, বৈষম্যহীন নীতি, মর্যাদা ও সমতার আলোতে বিচার করা প্রয়োজন।'' সরকার এও বলেছে, ''ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে মহিলাদের সংবিধান স্বীকৃত সম মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারকে শুধু ধর্মের কারণে অস্বীকার করা যায় কিনা এই মৌলিক প্রশ্নটা সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচার্য হওয়া উচিত।''

ভারতের সংবিধান সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং তা ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাস করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়েও সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা রয়েছে। সমাজের উন্নতির জন্য স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ দূর করা অত্যন্ত জরুরি। সংবিধানে ১৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেউ ধর্মের নামে কারও সাম্যের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। এটা যেমন হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি মুসলমান সহ অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। মোদী সরকার যদি এ বিষয়ে সংবিধানকে অনুসরণ করে তবে সেটা নিয়ে চেঁচামেচি করার কোনো অর্থ আছে কি?

তিন তালাক ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্রপূর্ণ দেশ, যেখানে প্রত্যেক ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের নিজস্ব নিয়ম-কানুন রয়েছে। তবে সেগুলি কখনই ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত ব্যক্তি-অধিকারগুলিকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও দেশে একটা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা মোটেই সহজ কাজ নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানদের এবিষয়ে সংসদের বাইরে আলোচনার টেবিলে বসা প্রয়োজন। পরে সংসদে এ নিয়ে একটা ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। আজ মুসলমান সমাজে এই অনুভূতিটা দিনেদিনে জোরালো হচ্ছে যে শরিয়তি আইনের কারণে মহিলাদের প্রতি অন্যায় বেড়ে চলেছে, যে কারণে অভিন্ন বিধির দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। তিন তালাক, বহুবিবাহ, এমনকী মুসলমান মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে ভুরি ভুরি আবেদন আদালতে আসছে।

আরশিয়ার বাবা নাসির বাগবান বলেছেন, ''সরকারকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে দেওয়া উচিত। আমার মেয়ের মতো কারোরই কষ্ট পাওয়া উচিৎ নয়। আমি একজন গরিব সবজি বিক্রেতা। মেয়ের পড়াশুনা শেষ করতে না দিয়ে বিয়ে দেওয়াটা আমার মস্ত বড় ভুল ছিল।'' অন্যদিকে আজমার গাঁয়ের প্রধান তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। ''তিন তালাক কিছু লোকের খেলার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বুঝতে পারে না যে এভাবে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যায়''--- এই বলেই তিনি থেমে থাকেননি। তিনি ও গাঁয়ের বয়স্ক ব্যক্তিরা আশেপাশের ৪০ জন গ্রামপ্রধান ও নেতার সঙ্গে একজোট হয়ে মন্তব্য করেছেন, ''আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তিন তালাকের পক্ষে দাঁড়াব না। মেয়েরা কি শুধুই পর্দার আড়ালে থাকবে আর বাচ্চা পয়দা করবে? তাঁদের স্বাধীনতা বলে কি কিছু নেই? আমরা সবাই ভুল করতে পারি, আবার ভুল শোধরাতেও পারি। কিন্তু এভাবে তালাক দেওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়।'' এসব মন্তব্য থেকে এ বিষয়টা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিছু মোল্লা-মৌলবির অনেক অপচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমান মহিলাদের যন্ত্রণা সহৃদয় মুসলমান পুরুষসমাজকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে। তাই সরকারকে অযথা দোষারোপ না করে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের উচিত তাদের কোথায় সমস্যা হচ্ছে সেটা দেখা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তারা সেটা না করে ধর্মের দোহাই দিয়ে একটা আদিম বর্বরোচিত প্রথার যথার্থতা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মরক্কো, মিশরের মতো মুসলমান দেশেও তিন তালাক নিষিদ্ধ। এর ফলে যাঁরা মনে করেন যে মুসলমানদের এই আদিম প্রথাকে আর বরদাস্ত করা উচিত নয় এবং লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণ অপ্রয়োজনীয়, তাঁদের যুক্তিটা সুদৃঢ় হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া অধ্যায় : এবারও কি বিচারহীনতার সংস্কৃতি দেখবে বাংলাদেশ?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। সাম্প্রদায়িক হামলার ক্ষত নিয়ে যারা বাঁচে তাঁদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক হামলার সম্পর্কে লেখা বড় কষ্টের। যখন দেখি, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে দেশটির অভ্যুদয় ঘটেছে, সে দেশে ৪৫ বছর পরও এক সংখ্যালঘু বৃদ্ধা পূর্ণিমা দাস বলছেন, 'ওরা দল বেঁধে আইছে। তছনছ কইরা দিছে। আমার পুলার বউয়ের দুই ভরি স্বর্ণসহ বাড়ির সব দামি জিনিসপত্র লুট কইরা নিছে। আমার দুই বছরের নাতিটা তখন ভয়ে কাঁপতাছে। কেউ একজন তহন কইলো, এইটারে জবাই কর। আমি হেরার কাছে কাকুতি মিনতি করলাম। একজন তহন কইলো, কানের দুলটা খুইলা দে। আমি ভয়ে ভয়ে দিয়া দিচি। গেছে। আমি আমার ৫৫ বছরের জীবনে এমন তাণ্ডব দেখছি না।' ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের পূর্ণিমা দাসের আর্তনাদে সেখানকার দেড়-দুশো পরিবারের পূর্ণিমাদের আর্তনাদ শুনছি। আর্তনাদ শুনছি পাবনার সাঁথিয়া, কক্সবাজারের রামু, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাটের হাজারো পূর্ণিমাদের। নাসিরনগরের আজকের দৃশ্য নতুন কিছু নয়। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। পোড়া ঘরবাড়ি, ছাই-ভস্ম, ধ্বংসস্তূপের দৃশ্য নতুন কিছু নয়। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। পোড়া ঘরবাড়ি, ছাই-ভস্ম, ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা, গীতা, অরুণ, গোপালদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা। তারা জানেন না, গন্তব্য কোথায়! ভবিষ্যৎ কী! প্রশাসনের দয়ার শরীর, কোনো কোনো পরিবারকে টিন ও অর্থ সাহায্য দিয়েছে। টিন ও অর্থ ধ্বংসের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল হলেও হয়তো নতুন করে দাঁড়াতে অসহায় পরিবারগুলোকে সাহায্য করবে। কিন্তু মনের গভীরে ক্ষত দূর হবে কি? যেমন দূর হয়নি পাবনা, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, কক্সবাজারসহ অন্যান্য এলাকায়। কারণ সাতচল্লিশ, পঞ্চাশ, চৌষট্টি পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও বারবার তাদের নতুন করে ঘর বাঁধতেই হচ্ছে। অথবা

নীরবে দেশত্যাগ করতে হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের হারের অধোগামী চিত্রটি এতো বেশি বার উল্লিখিত-উচ্চারিত হচ্ছে যে, এখানে উল্লেখের পরদিনই দেখা যাবে সেই হার আরও অধোগামী হয়েছে। তাই বিরত থাকছি। শুধু জবাব খুঁজছি সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পূর্ণিমা দাস, নমিতা রানিদের অসহায় কান্নার মধ্যে। পূর্ণিমা দাস আরও বলেছেন, 'ঘর ঠিক করনের লাইগ্যা তিন বার টিন পাইছি। আর নয় হাজার টাকা দিচ্ছে। কিন্তু ঘর সারাইতে আরও টেহা লাগবে। ঘরের জিনিসপত্র কেনা লাগবে। ঘর না অয় সারাইলাম, মনের জ্বালা সারামু কেমনে?' নমিতা রানি বলেন, মাছ ধরা তাদের পেশা। তাদের সব ক'টি জাল সেদিন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘর সারার জন্য দুই বান্ডিল টিন পেয়েছেন কিন্তু জীবন চলবে কীভাবে? হাত পেতে নেওয়া সাহায্য দিয়ে আবার সংসার সাজাতে হবে। এক কঠিন ও নির্মম পরীক্ষা। এ পরীক্ষা বারবার দিতে হচ্ছে সংখ্যালঘুদের।

পাবনার সাঁথিয়ায় ফেসবুকে কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে— গোটা হিন্দুপাড়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পর ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। তখন জোর প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, মানববন্ধন হয়েছিল রাজধানীসহ সারাদেশে। পরে এক সময় পুরো ব্যাপারটিই চাপা পড়ে যায়। অবশ্য কয়েকদিন পরেই জানা গিয়েছিল, ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার বিষয়টি জামায়াত ঘরানার সাজানো। জায়গা-জমি দখলের ব্যাপার ছিল। কিন্তু বলির পাঁঠা হয়ে গেল দশম শ্রেণীর এক হিন্দু ছাত্র। আর সব হারিয়ে পথে দাঁড়াতে হলো হিন্দুদের। সর্বশেষ খবর, সেখান থেকে কয়েকটি পরিবার দেশত্যাগ করেছে। কয়েক বছর আগে সাতক্ষীরায় শ্যামনগরে তোপের মুখে পড়েছিলাম হামলার শিকার শতাধিক হিন্দু পরিবারের নারী-পুরুষের। সেখানেও ছিল ধর্ম অবমাননার অভিযোগ। ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে ওদের আর্তি শুনেছি, 'আমরা আর দেশে থাকতে চাই না। আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের দরকার নেই'। পরে শুনেছি, ওই এলাকা থেকেও কয়েকটি পরিবার দেশত্যাগ করেছে। দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে বলদেব বাজারের পাশে তিনটি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম ধর্মান্ধদের হিংস্র হামলায় শূন্য জনপদে পরিণত হয়। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে সাহায্য নিয়ে গিয়েছিলাম, ২০১৩ সালে। সাহায্য নিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন লণ্ডভণ্ড জনপদের মানুষগুলো। তারা সবাই ছুটে এসে কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 'সাহায্য ফিরিয়ে নিয়ে যান। শুধু আমাদের ভারতে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন'। তাঁদের চেহারাগুলো এখনো ভাসছে, চোখেমুখে প্রচণ্ড ভীতি ও হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন ওঁরা।

নাসিরনগরের সাংসদ ও মন্ত্রী ছায়েদুল হক বলেছেন, নাসিরনগরে কিছুই হয়নি, মাত্র কয়েটা বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। এ সুরটা আমরা চিনি। ২০০১ সালে নির্বাচনের পরে সংখ্যালঘুদের ওপর ভয়াবহ হামলা ও দেশে-বিদেশে গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার পর সদ্য দায়িত্ব নেওয়া বিএনপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, তিনি হেলিকপ্টারে ঘুরে দেখেছেন কোথাও কোনো সাম্প্রদায়িক হামলা-নির্যাতন নেই। ছায়েদুল হকের কথায় যেন সেই সুরটাই

বাজছে। 'বাড়াবাড়ি করা' টেলিভিশনওয়ালারা ধ্বংসযজ্ঞের ছবি দেখাচ্ছে, আর তারই মাঝে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে বলতে শুনলুম, তেমন ক্ষতি হয়নি। যখন টেলিভিশনে খবর দেখাচ্ছিল, তখন পর্দায় শতাধিক বাড়িঘরের ধ্বংসস্তুপ, পোড়া টিন-বাঁশ, ছাইভস্ম। ক্ষতি অবশ্য সামান্যই, টিন-বাঁশ, মাটির বাড়িঘর, মন্দির পুড়িয়ে কিংবা গুঁড়িয়ে দিলে ক্ষতি এমন কী! দামই বা কত? কোটি টাকার বাড়ি তো নয়। মন্ত্রী সাংসদরা জানেন, যাদের ওপর হামলা হয়েছে, তারা সামান্য মানুষ। ভোট না দিয়ে যাবে কোথায়? ভোট অথবা দেশত্যাগ— দুটোর একটা বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প নেই। আর মন্দিরে হামলা হলে, আগুনে পুড়লে, দেব-দেবীর মূর্তি মাটিতে গড়ালে ধর্ম অবমাননারও কিছু নেই। সংখ্যালঘুদের আবার ধর্ম!

নাসিরনগরে হামলার অব্যবহিত পর হবিগঞ্জে এবং তারপর সারাদেশে কয়েকটি জেলায় হামলা ছড়িয়ে গেছে। এ নিবন্ধ লেখার সময়েও খবর পাচ্ছি হামলা অব্যাহত রয়েছে, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, রাজবাড়ি, কোথায় নয়? নাসিরনগরে প্রথম হামলার পর পুলিশ-বিজিবি মোতায়েন করা হয়। তার মধ্যেই ফের হামলা ও আগুন দেওয়া হয় আরও পাঁচ বাড়িতে। হামলা হয়েছে উপজেলায়। পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের বাড়িতে। কতখানি শক্তি এবং সামর্থ্য থাকলে এটা করা সম্ভব! প্রথমে নাসিরনগর থানার ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়। পরে প্রত্যাহার করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এ পর্যন্ত ৭২ জনকে। তিন স্থানীয় আওয়ামি লিগ নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, মূল নায়করা ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর প্রত্যাহার কি শাস্তি? যদি নাসিরনগরে ওই ওসি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন অন্যত্র দায়িত্বসচেতন হবেন এই নিশ্চয়তা কে দিচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী কর্তৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া প্রশাসনের কারো পক্ষে এই বিপজ্জনক 'গাফিলতির' ঝুঁকি নেওয়া কি সম্ভব? প্রত্যাহারের মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে কি বিপদ এড়ানো যাবে? আরও প্রশ্ন, আওয়ামি লিগ থেকে যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে, তাদের শাস্তি কি এইটুকুই?

রসরাজ দাস একজন স্বল্পশিক্ষিত যুবক। পেশা মাছধরা। যারাই নাসিরনগর পরিদর্শন করেছেন, তারা প্রশ্ন করছেন, ফেসবুকে রসরাজের পক্ষে কি ওই ব্যঙ্গচিত্র বানানো সম্ভব? ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর নাসিরনগরে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর মন্দির পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের বলেছেন, ধর্মীয় ওই ব্যঙ্গচিত্র তৈরি করতে যে মেধার প্রয়োজন রসরাজের তা নেই। সে চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণী পাশ। ওই ব্যঙ্গচিত্র তৈরি করতে কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়েছে। রসরাজ ফটোশপের কাজ তো দূরের কথা, কম্পিউটারও চেনে কিনা সন্দেহ রয়েছে। শাহরিয়ার আরও বলেন, হরিণবেড় গ্রামের এক আইনজীবীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি রসরাজের পক্ষে আদালতে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে দাঁড়াতে দেননি। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাহেব বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক শাহরিয়ার কবীরের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেছেন, ম্যাজিস্ট্রেট যেটি করেছেন সেটি সংবিধান পরিপন্থী কাজ। ম্যাজিস্ট্রেট রসরাজকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিমান্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শাহরিয়ার কবীর আরও বলেছেন, হরিণবেড় বাজারে আল আমিন নামে এক কম্পিউটারের দোকান থেকে ওই ব্যঙ্গচিত্র তৈরি করে রসরাজের ফেসবুকে আপলোড করা হয়। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। নাসিরনগরে হামলার পর যে সব সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি সেখানে গিয়ে ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা শিকার করেছেন যে, রসরাজের মতো একজন মৎস্যজীবী যুবকের পক্ষে এই ধরনের ব্যঙ্গচিত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। এক খবরে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে যখন ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার ছবি পোস্ট করা হয়, তখন অভিযুক্ত রসরাজ বিলে মাছ ধরছিলেন। তাঁর স্যামসাং অ্যানড্রয়েড মোবাইল সেটটি তখন বাড়িতে ছিল। ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে বিষয়টি জেনে তিনি বাড়ি ছুটে যান। খবরে আরও বলা হয়েছে, রসরাজ দাস ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার ওই ছবি আপলোড করেননি। গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছবিটি ঢাকা থেকে পোস্ট করা হয়েছে। কে করলো?

দুঃখজনক হচ্ছে এই ব্যঙ্গচিত্রের বিরুদ্ধে রসরাজকে ক্রুশবিদ্ধ করে অনেকে বিবৃতি দিয়েছেন। তারা জানতে চাইলেন না, এটা তার পক্ষে করা সম্ভব কিনা? পাবনার সাঁথিয়া কিংবা কক্সবাজারের রামু কিংবা অন্যত্র একই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কারা পেছনে আজও জানা গেল না। অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির কাবাশরিফ অবমাননা ও একে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলাকে চক্রান্তের অংশ বলেছেন। কিন্তু তিনি এও বলেছেন, এই সরকারের আমলে বারবার ইসলাম ধর্ম, বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) ও পবিত্র কাবা শরিফকে নিয়ে বিকৃত, অরুচিকর ও অপমানজনক মন্তব্য অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ এখানেও তিনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেছেন। রসরাজ দায়ী কিনা, গভীরে যেতে চাইলেন না। বিএনপি শাসন ক্ষমতায় ছিল, বিরোধী দলেও ছিল। বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে। আওয়ামি লিগের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনার পরদিন এক মন্তব্য করেছেন, যা টেলিভিশনে দেখেছি, তা আন্তরিক মনে হয়নি। প্রত্যাশিতও ছিল না। কারণ আওয়ামি লিগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই করা দল। তবে দুদিন পর ওবায়দুল কাদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা জানান। হামলার দুদিন পর আওয়ামি লিগের একটি প্রতিনিধিদল নাসিরনগর পরিদর্শন করে এসে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী খোঁজখবর রাখছেন, জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। শুনে ভালো লাগছে, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ও সিনিয়র আইনজীবীরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে রসরাজের পক্ষে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই ধরনের সিদ্ধান্ত যদি আগে নেওয়া হোত হয়তো পরিস্থিতি পাল্টে যেত। বলতেই হচ্ছে, জায়গাজমি দখল, বাড়িঘর-উপাসনালয়ে হামলা ও নির্যাতন-হুমকির মুখে দেশত্যাগে অভ্যস্ত হিন্দুদের ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার সাহস হচ্ছে, এটা যদি সত্যি হয় তাহলে তা বড় ব্যাপারই বটে। মাথা ঘামাবার মতো। ■

ভালো মানুষের পাড়ায়

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইচ্ছের সঙ্গে শক্তি যোগ হলে মানুষ পারে না এমন কোনো কাজ নেই। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও মানুষের ইচ্ছেশক্তির সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। স্টিফেন হকিং থেকে শুরু করে মনসুর আলি খান পতৌডি, কিংবা দীপা মালিক— প্রমাণ অজস্র। দুর্দমনীয়দের তালিকায় আর একটি উজ্জ্বল নাম নাগা নরেশ কারুতুরা।

বাবা পেশায় লরিচালক আর মা সাধারণ গৃহবধূ। স্কুলের গণ্ডী পেরোননি কেউই। তার ওপর ছোটবেলায় দুর্ঘটনার ফলে নরেশের দুটো পা-ই কেটে বাদ দিতে হয়। এই

অবস্থায় নরেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়াই ছিল নিয়তি। কিন্তু তা হয়নি। বরং জীবনের মরমি আলোয় আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

নরেশের জন্ম অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী তীরস্থ তিপারু গ্রামে। ছোটবেলায় চলন্ত লরি থেকে পড়ে গিয়ে পা হারাতে হয়। সেটা ছিল ১৯৯৩ সাল। স্কুলে তখন সংক্রান্তির ছুটি। মনে পড়লে নরেশ এখনও অন্যমনস্ক হয়ে যান। এক বিখ্যাত বেসরকারি হাসপাতালের ঠিক সামনে ঘটেছিল দুর্ঘটনা। কিন্তু ওই হাসপাতাল নরেশের চিকিৎসা না করে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এক পুলিশ কনস্টেবল সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নরেশকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

সেদিনের বেসরকারি হাসপাতালের প্রত্যাখ্যান তাকে পীড়া দেয় ঠিকই কিন্তু যখনই সেই সহৃদয় কনস্টেবলের কথা মনে পড়ে তিনি অনুভব করেন জীবনের ভালোমন্দ একসঙ্গে শর্তছাড়া গ্রহণ করতে পারার নামই সুখ। তিনি নিজেকে করুণা করতে চান না। কারণ তা করলে লরিচালকের ছেলের গুগলের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হওয়া হোত না।

নরেশ স্বীকার করেন পা চলে যাওয়ার পর তার জীবনে কোনো নাটকীয় পরিবর্তন আসেনি। সাধারণ, স্বাভাবিক একটা শৈশব। তেমনই কৈশোর। সারাক্ষণ মজা করার মতো আর প্রাণ খুলে হাসার মতো কয়েকজন ভালো বন্ধু ছিল তাঁর। মেধাবী ছাত্র ছিলেন কিন্তু অনেকবার মনে হয়েছে এবার বোধহয় পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু ভাগ্য ছিল সহায়। বাবা-মা এই সময় গ্রাম ছেড়ে তানুকু নামের এক ছোট শহরে চলে আসেন। নরেশকে ভর্তি করে দেওয়া হয় এক মিশনারি স্কুলে। অনেক বন্ধু হলো। এমন বন্ধু যারা কোনোদিন নরেশকে প্রতিবন্ধী হিসেবে দেখেনি। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাশ করে নরেশ আই আই টি চেন্নাইয়ে ভর্তি হলেন। সেখানকার পরীক্ষায় নরেশের সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হলো ৯৯২। শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ। আর পিছন ফিরে দেখতে হয়নি।

চেন্নাইয়ের জীবনটা ছিল অদ্ভুত। বিচিত্র সব গল্পে ভরা। কত যে অপরিচিত মানুষের সাহচর্য পেয়েছেন! একবার ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। নাম সুন্দর। নরেশের ইতিহাস জেনে তিনি ব্যথিত। প্রতিভাবান ছেলেটিকে সাহায্য করার ইচ্ছে হলো। নরেশের হোস্টেল ফি বরাবর তিনিই দিয়েছেন। যে হাসপাতালে ছোটবেলায় নরেশের চিকিৎসা হয়েছিল সেখানকার কর্তৃপক্ষ কলেজ ফি দিতে এগিয়ে এলেন। চেন্নাইয়ের আই আই টি ভবনে লিফট ছিল না। নরেশের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তার জন্য লিফট বসল। কম্পিউটার সায়েন্সের ডিন অধ্যাপক ইদিচানডি এবং ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক প্রসাদের উদ্যোগে এল বিদ্যুৎচালিত হুইলচেয়ার। যে হুইলচেয়ারে বসে তিনি সারা বিশ্বকে দেখলেন এবং জয় করলেন। কেন করবেন তিনি নিজেকে করুণা! কেন মনে রাখবেন এক-আধটা অমানবিক মুখ। জীবন তার কাছে মানবিকতার পাঠশালা আর পৃথিবী ভালো মানুষের পাড়া।

পাশ করার পর চাকরির প্রস্তাব এসেছিল মরগ্যান স্ট্যানলি আর গুগলের কাছ থেকে। নরেশ কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র। তাঁর উৎসাহ ডিজিটাল দুনিয়ার নিত্যনতুন রহস্যভেদে। তাই তিনি বেছে নিয়েছেন গুগলকে। পৌঁছে গেছেন আকাশের কাছাকাছি। পুরনো কথা উঠলে এখনও বালকের মতো হাসেন। বলেন, 'পৃথিবীটা খুব ভালো। এখানে শুধু ভালো মানুষের বাস।' ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

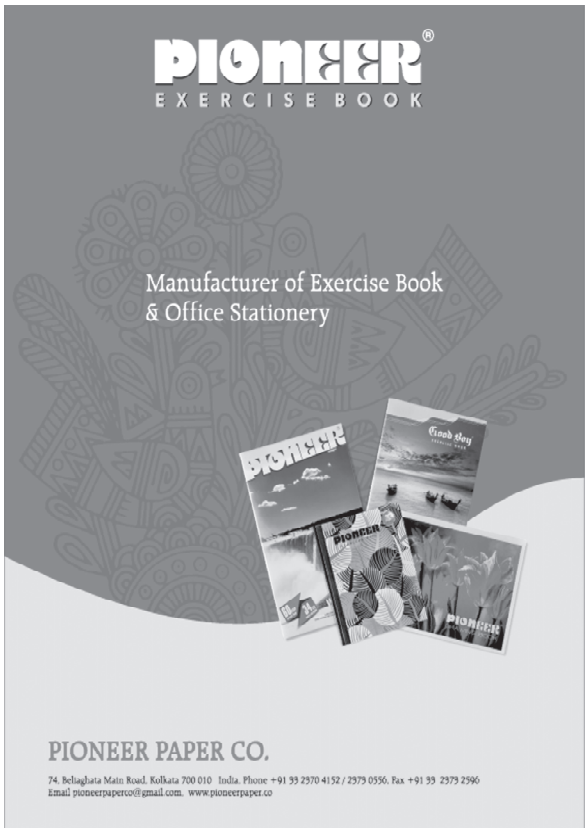

"মায়ের কোলে শিশু (যীশু)-—খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের ঈশ্বরবিষয়ক এই প্রগাঢ় ভাবের সম্মুখীন হলে আমাদের হৃদয়ে সুগভীর আলোড়ন জাগে। বহু দুঃখে নিপীড়িত, ভালবাসার অগ্নিতে উদ্দীপিত, শিশুর দোলনার পাশে মাতৃরূপে অবস্থিত, ক্রুশের পাদদেশে গভীর বিনতিতে মহিমময় হয়ে উপাসনারত— একটি নারী হৃদয়ের এই অপূর্ব আদর্শ মানবতার ইতিহাসে ক্যাথলিক চার্চের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলির অন্যতম।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সুস্থ থাকুন, সহজ প্রাণায়াম করুন

আশীষ পাল

সহজ প্রাণায়াম : মূলত গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করাকে সহজ প্রাণায়াম বলে। এই প্রাণায়াম শিশু-বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ রোগী ইত্যাদি সকলেই করতে পারেন। পদ্ধতিগুলি সহজ ও সরল। ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা কম। বিশেষ করে দৈহিক সমস্যার জন্য যাদের ব্যায়াম ও আসন করা নিষেধ তাদের ক্ষেত্রে এই প্রাণায়াম অমৃততুল্য।

সহজ প্রাণায়াম-১ (হাঁপানি রোগের জন্য বিশেষ সহায়ক) :

স্থিতি : সুখাসন পদ্মাসনে বসে বা দাঁড়িয়ে করা যেতে পারে। প্রথমে দুই নাক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিন, পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করার পর মুখ দিয়ে তৈলাক্ত ধারার মতো ফুঁ দিয়ে শ্বাস সজোরে ছাড়তে থাকুন। এই ভাবে প্রথম দিকে ৬-৮ বার করতে হবে। তারপর টানা ২ থেকে ৩ মিনিট পর্যন্ত অভ্যাস করতে হবে।

সহজ প্রাণায়াম-২ (সর্দি, কাশি ও ব্রঙ্কাইটিসের জন্য) :

স্থিতি : আগের মতো। তারপর মাথাকে পিছনের দিকে সামান্য হেলিয়ে দুই নাক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিতে হবে। শ্বাস নেওয়া শেষ হলে চিবুক হাল্কা ভাবে ঠেকিয়ে দুই নাক দিয়ে গতির সঙ্গে শ্বাস ছাড়তে হবে। আবার মাথা পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্বাস নিন এবং চিবুক ঠেকানোর সময় শ্বাস ছাড়ুন। প্রথমে ২ মিনিট করার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ২ মিনিট করুন।

সহজ প্রাণায়াম-৩ (কণ্ঠস্বরের জন্য এবং গলার জন্য) :

স্থিতি : আগের মতো। প্রথমে দুই নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে হাঁ করে মুখ দিয়ে খুব জোরে শ্বাস ছাড়ুন। মাত্রা— ৮ থেকে ১০ বার এক নাগাড়ে।

সহজ প্রাণায়াম-৪ (হজমশক্তি বৃদ্ধির জন্য) :

স্থিতি : আগের মতো। দুই নাক দিয়ে শ্বাস নিতে নিতে তলপেট যতটা সম্ভব মেরুদণ্ডের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বুক ও পেট শিথিল করুন। মাত্রা— ৮ থেকে ১০ বার।

সহজ প্রাণায়াম-৫ (উচ্চ রক্তচাপ কমানো) :

স্থিতি : আগের মতো। দুই নাক দিয়ে বেশ ধীরে ধীরে গভীর ভাবে শ্বাস নিন, চিন্তা করুন শুদ্ধ বায়ু শরীরে প্রবেশ করছে, তারপর মুখ দিয়ে খুব আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়ুন, শ্বাস ছাড়ার সময় পাখির ঠোঁটের মতো দু-ঠোঁটের মধ্যে সামান্য ফাঁক থাকবে। এমন ভাবে শ্বাস ছাড়তে হবে মনে হয় যেন আপনা আপনিই হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। শ্বাস নেওয়ার সময় শরীর টানটান এবং শ্বাস ছাড়ার সময় ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। একটানা ২-৩ মিনিট অভ্যাস করুন। চোখ বন্ধ ঘরে রাখলে বিশেষ লাভ পাওয়া যাবে।

সহজ প্রাণায়াম-৬ (মানসিক শক্তি বৃদ্ধি) :

স্থিতি : প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। তার পর দুই হাত আঙুল পেচিয়ে নাভির উপর রাখুন। এরপর দুই নাক দিয়ে শ্বাস নিন ধীরে ধীরে, তারপর ধীরে ধীরে দুই নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়ুন। শ্বাস নেওয়ার সময় পেট যেন না ফুলে, বুক প্রসারিত হয়েছে অনুভব হয় এবং শ্বাস ছাড়ার সময় দেহ যেন শিথিল হচ্ছে অনুভব হয়। আবার একই ভাবে নেওয়া ও ছাড়া। মাত্রা— ২ থেকে ৩ মিনিট। শ্বাস নিতে নিতে মনের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে অনুভব করুন এবং ছাড়ার সময় রোগের জীবাণু ও দুর্বলতা দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অনুভব করুন।

সহজ প্রাণায়াম-৭ (স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধির শক্তি বাড়ানো) :

স্থিতি : প্রথমে বজ্রাসনে বসুন, তারপর হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দু-হাত বুকের কাছে রাখুন। দুই নাক দিয়ে শ্বাস নিতে নিতে আস্তে আস্তে মাথা ও দেহের উর্ধাংশ পিছনের দিকে ঝুঁকিয়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সোজা হয়ে হাঁটুর উপর দাঁড়ান। এই ভাবে শ্বাস নিতে নিতে পিছনের দিকে ঝুঁকুন ও শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সোজা হয়ে যান। ৬-৮ বার করার পর শবাসনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।

সহজ প্রাণায়াম-৮ (স্নায়ুতন্ত্রের সতেজতা বৃদ্ধি) :

স্থিতি : প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই পাশ থেকে দুই হাত মাথার উপর তুলুন, শ্বাস নিতে নিতে গোড়ালি তুলে সমস্ত শরীর টান করুন। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে গোড়ালি নামান এবং হাত শিথিল করে আগের অবস্থায় আনুন। অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে গোড়ালি তুলে দেহ টান এবং শ্বাস ছাড়ার সঙ্গে শিথিল করুন। এই ভাবে ৮ থেকে ১০ বার করুন।

সহজ প্রাণায়াম-৯ (হাত ও পা-এর বাতের ব্যথার জন্য) :

স্থিতি : প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। দুই হাত শরীরের পাশে, তারপর দুই হাত মাথার উপর তুলুন দুই নাক দিয়ে শ্বাস নিতে নিতে তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে (দুই নাক দিয়ে) আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। এইভাবে ১৫ থেকে ২০ বার করুন একনাগাড়ে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া : চিৎ হয়ে শুয়ে দুই হাত শরীরের পাশে রাখুন। শ্বাস নিতে নিতে ডান পা-কে টান করে যতটা সম্ভব ওপরের দিকে তুলুন। হাঁটু সোজা রাখার চেষ্টা করুন। প্রথম প্রথম হাঁটু সামান্য ভাঙলে ক্ষতি নেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ডান পা নামানোর পর আবার শ্বাস নিতে নিতে বাঁ পা তুলুন ও শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নামান। এই ভাবে একবার ডান পা ও একবার বাঁ পা তুলে দু পায়ে মোট ২০ বার করুন।

সহজ প্রাণায়াম-১০ (ক্লান্তি দূর করতে) :

স্থিতি : নিজের সুবিধামতো বসে/দাঁড়িয়ে প্রথমে গভীরভাবে শ্বাস নিন। ধীরে ধীরে যতটা নেওয়া যায়, শ্বাস গ্রহণ শেষ হলে ধীরে ধীরে দীর্ঘসময় ধরে শ্বাস ছাড়ুন। মনে রাখতে হবে, মুখ যেন বন্ধ থাকে। শ্বাস গ্রহণের সময় ভাবুন শরীরে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন প্রবেশ করছে এমনকী কার্যশক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। ছাড়ার সময় ভাবুন কার্বন ডাই-অক্সাইড শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে সমস্ত ক্লান্তি দূর হচ্ছে। টানা ৪-৫ মিনিট অভ্যাস করুন।

স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের রাজ্য সম্মেলন

গত ২১-২২ অক্টোবর কলকাতায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বালিগঞ্জ কার্যালয়ে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রীমৎ স্বামী সর্বাত্মানন্দজী মহারাজ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশব দীক্ষিত, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ বাহিনী প্রমুখ অন্নদাশঙ্কর পাণিগ্রাহী। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সভাপতি এবং শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ করেন প্রধান অতিথি। প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে আরও দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়— (১) আগ্রাসন ও ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব ও সমাধানকল্পে স্বদেশি অর্থনীতি, (২) পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও সমাধানকল্পে স্বদেশি অর্থনীতি, (৩) জিন-পরিবর্তিত খাদ্যবীজ ও ভারতীয় কৃষিতে তার প্রভাব ও সমাধানকল্পে স্বদেশি কৃষিনীতি। সম্মেলনে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় সহ-সংযোজক ধনপতরাম আগরওয়াল, প্রখ্যাত জিনবিজ্ঞানী তুষার চক্রবর্তী ও প্রখ্যাত পরিবেশবিদ মোহিত রায় প্রমুখ। ২২ অক্টোবর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় সংযোজক অরুণ ওঝা। প্রদেশ থেকে প্রায় ৭৫ জন প্রতিনিধি রাজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ডোমজুড়ে ভারতমাতা পূজা

গত ৬ নভেম্বর হাওড়া জেলার ডোমজুড় খণ্ডে চারদিন ব্যাপী ভারতমাতা পূজার উদ্বোধন করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রদীপ প্রজ্বলন করে উদ্বোধনের পর উরির শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে সবাই নিহত জওয়ানদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে দিলীপবাবু বহির্বিশ্বে ভারতীয়দের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি এবং দেশের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়গুলি উল্লেখ করেন।

৭ নভেম্বর পুণ্যভূমি ভারত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অনির্বাণ দেব এবং হারাধন ভট্টাচার্য। ৮ নভেম্বর চীনা আগ্রাসন এবং সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সুমন ঘোষ। ৯ নভেম্বর নরনারায়ণ সেবা হয়। ডোমজুড় সর্বজনীন ভারতমাতা পূজা কমিটির আয়োজনে ডোমজুড় থানার সামনে এই পূজা এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়।

সমাবেশ সমাচার

খন্যান ও মাখান্ডীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

গত ৮ নভেম্বর হুগলী জেলার খন্যান ও মাখান্ডী গ্রামে সহস্র চন্দ্র দর্শন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় ৮২ বছর বয়স্ক অধ্যাপক সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য এবং ৯১ বছর বয়স্কা বীণাপানী ঘোষকে। উভয়কেই নববস্ত্র, পাঁচ রকম শুকনো ফল, মিষ্টান্ন এবং গীতা প্রদান করা হয়। কার্যক্রমে বক্তব্য রাখেন পরিবার প্রবধনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র। এছাড়াও প্রাক্তন প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ বাসুদেব ঘোষ ও অধ্যাপক অতনু চক্রবর্তী এবং শেখর ভট্টাচার্য মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে সুনীলেন্দুবাবু আবেগপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। উভয় কার্যক্রমেই পরিবারের সদস্য এবং পাড়া প্রতিবেশীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পরিচিতি বর্গ

গত ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর সেবিকাদের একটি সমিতি পরিচিতি বর্গ অনুষ্ঠিত হলো বাঁকুড়া বড়কালীতলা সরস্বতী শিশু মন্দিরে। এই বর্গে ৩৩ জন সেবিকা অংশ নেয়। সমিতির জেলা সঞ্চালিকা সান্ত্বনা ব্যানার্জী ও জেলা কার্যবাহিকা মৌসুমি বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় বর্গ সম্পন্ন হয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার উপর এক নয়া পশ্চিমি ষড়যন্ত্র

নারায়ণ চন্দ্র দে

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ভিত্তি বৈদিক মুনি-ঋষিদের নির্দেশিত জীবনধারা। বৈদিক সমাজজীবন ছিল বিদ্বেষ, বিভেদহীন জীবন। মুনি-ঋষিগণ শেখাতেন, 'মা বিদ্বিষাবহৈ' (বিদ্বেষ কোরো না), 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধ কস্যস্বিদ্ ধনম্' (ত্যাগের সহিত ভোগ করিবে, কাহারও ধনে লোভ করিও না), 'সর্বে ভবন্তু সুখিন' (সকলে সুখী হোক)। কিন্তু আজ ইউরো-মার্কিন ভোগবাদ পরিকল্পিতভাবে ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারাকে কলুষিত করে তুলছে। বহু বিদেশি শাসক ভারতে রাজ করছে, তারা এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু এদেশের সমাজজীবনকে তারা লুণ্ঠন করেনি। এই কাজটি করেছে ও করছে ইউরো-মার্কিন পুঁজিবাদী দেশগুলো।

পুঁজিবাদ শুধু পুঁজি বিনিয়োগ করেই নিশ্চিন্ত থাকে না। তলে তলে সে পুঁজির অনুকূল পরিবেশও তৈরি করে নেয়। পুঁজির জন্য চাই বাজারের বিস্তার। বাজারের বিস্তার নির্ভর করে পণ্য উপভোক্তার বিস্তারের উপর। যে সমাজে রয়েছে নিয়ন্ত্রিত পরিবারতন্ত্র, সে পরিবারতন্ত্র পরিচালিত হয় এক সুশৃঙ্খল অভিন্ন বিধিনিষেধ দ্বারা, সেই সমাজব্যবস্থা পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের পরিপন্থী। পুঁজিবাদ তাই পুঁজির বিকাশের অনুকূল দর্শনেরও প্রচার চালায় তার পুঁজির দাসেদের মাধ্যমে, যেমনটি অষ্টাদশ শতকে চালিয়েছিল ভোগবাদী দার্শনিক এপিকিউরাস তাঁর বাণীর মাধ্যমে— 'ইট, ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি' (খাও, পিয়ো আর জিও)। পুঁজিবাদের চোখে সব কিছুই ভোগ্যপণ্য। সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প সমস্ত কিছুই পুঁজির অধীন। পুঁজির স্বার্থেই এগুলি পরিচালিত হয়। সামাজিক সম্পর্কের মূল্যবোধ দ্রুত ভেঙে পড়ছে। পণ্যের জন্য বাজারের বিস্তার চাই। একই পরিবার ভেঙে বহু পরিবার তৈরি করার প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের বাজার বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে। এই কাজে চরম ভোগবাদ ও বন্ধনহীন অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার প্রচারই পুঁজিবাদের কর্পোরেট কালচার।

এই প্রচারে যুবক-যুবতী, নবীন-প্রবীণ নির্বিশেষে সকল নারী- পুরুষই আজ পুঁজিবাদের পণ্যে পরিণত হয়েছে। এই কাজে বিজ্ঞাপনের লোভে সাহায্য করছে আমাদেরই দেশের সংবাদপত্রগুলি। এই বিজ্ঞাপনগুলি আবার খবরের ঢঙে ছাপানো হচ্ছে। যেমন কিছুদিন আগে একটি বহুলপ্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রে ব্যয়বহুল কর্পোরেট কমফর্ট হোম, শেল্টার্ড অ্যাকোমোডেশন, রিটায়ার্ড রেসিডেন্সি নামক কর্পোরেট লবি-চালিত তথাকথিত বৃদ্ধাশ্রমগুলির পক্ষে প্রচার চালানো হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনী খবরে সাংবাদিকদের কলমে লেখা হয়েছে— সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'জীবনটাকে উপভোগ করা'। তাদের মতে, অধিকাংশ প্রবীণ নাগরিক 'এইসব আধুনিক বৃদ্ধাশ্রমে আসছেন স্বেচ্ছায়, পরিকল্পনা করে'। 'জীবনটাকে আরও স্বচ্ছন্দভাবে আকণ্ঠ পান করতে'। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক বিলাসবহুল বার্ধক্য আবাসনের এক আবাসিক প্রবীণ নাগরিকের মুখে লেখা হয়েছে, 'সমবয়সীদের সঙ্গে ওয়াইনের গ্লাস হাতে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি,— একসঙ্গে থাকলে বরং ইচ্ছে-অনিচ্ছে নিয়ে সমস্যা বাঁধত'। ভাবুন একবার, কোন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার বরাত পেয়েছে এইসব সংবাদপত্রগুলি! শুধু সংবাদপত্রেই নয়, সিনেমা শিল্পকেও এই কর্পোরেট লবি ব্যবহার করছে তাদের অনুকূল বাণিজ্যিক স্বার্থে। এই ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতেই আগামী ২৫ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে নতুন ছবি 'বেঁচে থাকার গান'। এই ছবিতে প্রবীণ-প্রবীণাদের ভোগবাদী কর্পোরেট বার্ধক্য-আবাসনগুলির প্রতি প্রলুব্ধ করা হচ্ছে এক নবীনা মনোবিদের

মাধ্যমে। শুনবেন এই বিলাসবহুল বার্ধক্য-আবাসন- গুলিতে থাকার নজরানা কত? ভোগের মাপকাঠিতে জমা রাশির পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পরিমাণ যতদিন যাবে তত বাড়বে। প্রচার যত বাড়বে, খরচের বহরও তত বাড়বে। কর্পোরেট পেশাদার সংবাদপত্রগুলোতে চলছে নানান চটকদারি প্রচার। আজকাল প্রবীণা মহিলারা নাকি তাদের অসুস্থ ও অক্ষম স্বামীদের সঙ্গে থাকতে চাইছেন না। তাঁরাও নির্ঝঞ্ঝাট স্বাধীন বিলাসবহুল কমফর্ট হোমগুলোতে আকৃষ্ট হচ্ছেন। নিজ গৃহে অর্থের বিনিময়ে একাকিত্ব ঘুচিয়ে দেওয়ার স্কিমও নিচ্ছে এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো।

একদিকে প্রবীণ নাগরিকদের সমাজজীবনের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে চরম সরকারি অনীহা। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি আইন আছে বটে কিন্তু সরকারি প্রশাসন তার প্রয়োগ তো দূরের কথা, তার প্রচার পর্যন্ত করে না। হয়ত কর্পোরেট লবির অদৃশ্য হাতও থাকতে পারে এর পিছনে। কর্পোরেট কমফর্ট হোমগুলি তো উচ্চবিত্তদের জন্য। নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের কে দেবে কমফর্ট? কোন্‌দিন হয়তো শুনব এইসব কমফর্ট হোমগুলিও বিদেশি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

এবার আসি এই নিবন্ধের শিরোনামের বিষয়ে। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে ভারতবর্ষে আজ বিদেশিরা কেবল পুঁজি বিনিয়োগই করছে না, বিদেশি সংস্কৃতিও বিনিয়োগ করছে। এটাই আপত্তির। বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার করে তারা এ কাজ করছে। আমাদের স্বদেশি জাত্যাভিমানী সরকারের আমলেও এই ধরনের ভারতীয় সংস্কৃতিবিরোধী বিজ্ঞাপন স্পনসররা আকছার প্রচার করছে সংবাদমাধ্যমগুলিতে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিন্দুমাত্রও নেই। বিদেশি অর্থে লালিত কিছু এনজিও নারীবাদী সংগঠন লাগাতার ভারতের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে এই সমাজব্যবস্থা আসলে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা। এরা পরিকল্পিতভাবে এদেশটিকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থাৎ নারীশাসিত সমাজব্যবস্থায় পরিণত করতে চাইছে। এরই লজ্জাজনক প্রতিফলন আমরা দেখছি ভারতীয় খেলোয়াড়দের জামার পিছনে। খেলোয়াড়ের নাম নেই। আছে তাদের মায়ের নাম। কেন? তাদের কী পিতৃপরিচয় নেই? এ তো লজ্জার কথা! আদিম সমাজের কথা। আদিম সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক কারণ নারী তখন ছিল অরক্ষিত। তার সন্তানের পিতৃপরিচয় ছিল অজানা।

ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের খণ্ডে 'সত্যকাম-জবালা উপখ্যানে' এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক করুণ ঘটনার কথা আমরা জানি। সত্যকাম তাঁর মাতা জবালার কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর গোত্র কী? তার উত্তরে তাঁর মাতা বলেছিলেন— 'পুত্র, তোমার কোন্‌ গোত্র তা আমি জানি না। যৌবনে বহু বিচরণ করে বহু লোকের পরিচর্যা করে তোমাকে পেয়েছি। তাই আমি জানি না তোমার গোত্র। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম। তাই বলিও, 'আমি সত্যকাম জাবাল'। এর পরের কাহিনি সত্যকামের কঠোর সাধনা। মানুষের সামাজিক উত্তরণের ইতিহাস। আদিম জৈবিক সামাজিক জীবনের অরক্ষণীয়া নারী পেয়েছে একক গৃহের সুরক্ষিত সংসার। আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উত্তরণ ঘটেছে সমাজবিবর্তনের ধারায় পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। ভালো কিংবা মন্দের বিচারে এটি অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্য ব্যবস্থা নয় কী? আজ বিদেশিদের চক্রান্তে মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলি তাদের জামার পিঠে যখন লিখছে 'সন অব দেবকী' ও 'সন অব সুজাতা' তখন তাঁরা হয়তো শোনেইনি সেদিনের সত্যকামের মায়ের সেই করুণ কাহিনি। তাঁদের মায়েদের কী সেই অবস্থা হয়েছিল? নিশ্চয়ই নয়। একাজ তারা করেছে স্রেফ পয়সা কামাতে। বিদেশিরা জেনে বুঝেই একাজ করেছে। তারা হিন্দু সমাজকে কলুষিত করার নানান গবেষণা করছে, তা যদি না হোত তবে নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়দের জামার পিঠে এই রকম লিখল না কেন? ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান অনুরাগ ঠাকুর একজন হিন্দুত্ববাদী হওয়া সত্ত্বেও এরকম ঘটনা ঘটলো কীভাবে তা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

আমাদের সমাজব্যবস্থা কী পিছু হটবে, না কী সামনের দিকে এগিয়ে যাবে? বৃহদারণ্যক উপনিষদে মুনি-ঋষিরা বলে গিয়েছেন— 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি।' (অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে আলোয় লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।' আমরা কি অন্ধকার আদিম যুগে ফিরে যাব?

পূর্ণকালীন কার্যকর্তা চাই

গো-ভিত্তিক গ্রাম বিকাশের জন্য

গো-সেবা পরিবার গ্রাম বিকাশের জন্য গো-ভক্ত, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের পূর্ণ সময় দিয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এই কাজের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ বছর। গো-সেবা পরিবার থাকা ও সেবানিধির ব্যবস্থা করবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন।

গো-সেবা পরিবার

৫২৪ বি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৩

ফোন নং - ৯৩৩১০২৭৪৭১ (ADVT.)

শব্দরূপ-৮১০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			■	■	
■	■		■	৬	৭	■	■
■	■	৮	৯	■		■	■
১০	■	■	১১			■	১২
	■	■		■		■	
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত দার্জিলিং-এর শহর, সিংকোনা চাষের জন্য বিখ্যাত, **৩.** রাজার রাজা; কুবের, **৫.** ঠগদস্যু, **৬.** 'মরা হাতি — টাকা' (প্রবাদ), **৮.** রামায়ণে বানরদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার, **১১.** বিনা বেতনে কাজ ('— খাটা'), **১৩.** ভারতের প্রদেশ বিশেষ; রাজপুতানা, **১৪.** গূঢ় বা গুপ্ত তত্ত্ব।

উপর-নীচ : ১. বৈষ্ণবের মহোৎসব, **২.** মৃত্যুর পর পুনর্বার সজীব হওয়া, **৩.** রামচরিত্রাভিনয়, **৪.** ইন্দ্রের পুত্র, **৭.** সাবধান, হুঁশিয়ার, **৯.** ওষ্ঠাগতপ্রাণ, **১০.** উত্তরপ্রদেশের নগরবিশেষ; কৃষ্ণের জন্মভূমি ও লীলাভূমি, **১২.** সমবয়সী বন্ধু, সখা।

সমাধান
শব্দরূপ-৮০৭
সঠিক উত্তরদাতা

সঞ্জয় পাল
সাহাপুর, মালদা
হিতেন মাহাতো
রানিবাঁধ, বাঁকুড়া

তৈ	জ	স	■	ত	লা	ত	ল
ল	■	র্ব	■	র	■	■	ক্ষ্ম
পা	■	দ	রা	জ	■	■	ণ
■	■	ম	■	মা	ঘ	■	■
■	■	ন	গ	■	টো	■	■
আ	■	■	ম	রু	ৎ	■	ভি
প	■	■	গ	■	ক	■	ষ
ন	রো	ত্ত	ম	■	চ	র	ক

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮১০ সংখ্যার সমাধান আগামী ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

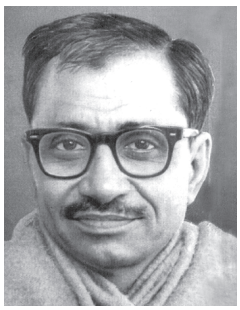

ব্যবসা-বাণিজ্য যদি সাফল্যের সঙ্গে চালাতে হয়, তাহলে পুরোপুরি আর্থিক ভিত্তিতে সর্বজনিক কল্যাণের দৃষ্টিতে চালানো জরুরি। তা রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের বাইরে রাখতে হবে। সেজন্য তাকে স্বশাসিত নিগমের দ্বারা পরিচালিত করা প্রয়োজন।

* * *

সামাজিক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে ব্যাপক বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ করতে হবে। আমরা এর আগেই নিশ্চিত করেছি যে, আমাদের সামাজিক লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রের সুরক্ষা-সামর্থ্য বাড়ানো, ভোগ্যবস্তু বাড়ানো, সব হাতে কাজ, ন্যূনতম জীবনস্তর বৃদ্ধি, বৈষম্য দূর করা এবং বিকেন্দ্রীকরণ করা। খোলা বাণিজ্য ও মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আমরা দেশের শিল্প-বাণিজ্য বাড়াতে পারিনি। দেশের ও স্বদেশি ভাবনার মাধ্যমে জনশক্তি সংগঠিত করেই দেশের শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি হয়। এখন আমরা যখন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা ভাবছি তখন দেশের নিরাপত্তা প্রদানকে অনিবার্যরূপে স্বীকার করতে হবে। এই নিরাপত্তা দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে এবং দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতে দিতে হবে।

* * *

আজকের পরিস্থিতিতে দেশের অর্থব্যবস্থার অভিমুখ বদল করতে যদি কোনো শব্দের প্রয়োগ করতে হয়, তবে তা হলো 'বিকেন্দ্রীকরণ' এবং 'স্বদেশিকরণ'। বর্তমানে 'কেন্দ্রীয়করণ' আমাদের জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয়করণই অর্থব্যবস্থার ভিত্তি— এটাকে আমরা মান্যতা দিয়ে ফেলেছি। সেজন্য তার দুষ্পরিণামের চিন্তা না করে অথবা জেনেও সেদিকে এগিয়ে চলেছি। একই দশা 'স্বদেশি'করণের। বিদেশি সব জিনিস আমরা বড় লোভে কিনে চলেছি। এখন আমরা বিদেশি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এটা প্রগতি নয়। এতে উন্নতি হয় না। এর ফলে 'স্ব' ভুলে অস্তিত্ব বাড়িয়ে ফেলবো। স্বদেশিকরণের ভাবাত্মক দিক হৃদয়ঙ্গম করে তাকে আমাদের উৎপাদনের ভিত্তি ও অবলম্বন করতে হবে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ১২

তিন তালাক এবং বহুবিবাহ সভ্যতার পরিপন্থী : জাতীয় মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তিন তালাক এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান বহাল রেখে জাতীয় মহিলা কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিল এই ধরনের প্রথা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং এর জন্য বহু মহিলার জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা এক এফিডেভিটে কমিশন জানিয়েছে, 'বেশ কিছু তালাকপ্রাপ্ত মুসলমান মহিলার কেস পর্যবেক্ষণ করার পর কমিশন মনে করছে তিন তালাক এবং বহুবিবাহের মতো প্রথা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। কারণ এই প্রথার মাধ্যমে মুসলমান মহিলাদের সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ফলত মহিলাদের জীবন এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। সুতরাং তিন তালাক এবং বহুগামিতার মতো প্রথা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারও সম্প্রতি প্রথাদুটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আরজি পেশ করেছে। সেইসঙ্গে, দেশ থেকে লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার প্রস্তাবও দিয়েছে সরকার। সরকারি এফিডেভিটে বলা হয়েছে, আফগানিস্তান, মরক্কো, টিউনিসিয়া, তুর্কি, ইন্দোনেসিয়া, মিশর এবং ইরানের মতো ইসলামিক রাষ্ট্রেও তিন তালাকের মতো প্রথা হয় নিষিদ্ধ নয় তো শর্তাধীন। একমাত্র ভারতেই তা পুরোমাত্রায় বহাল। সভ্যতার পরিপন্থী এই প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপ করতে না পারলে মুসলমান মহিলাদের শারীরিক এবং মানসিক নিরাপত্তা কোনোদিনই সুনিশ্চত করা সম্ভব হবে না।

ছাবাহার বন্দর নির্মাণে ভারতের পাশে জাপান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইরানের ছাবাহার বন্দর নির্মাণে ভারতের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে জাপান। সেইসঙ্গে এই উদ্যোগে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুই দেশের কাছেই কৌশলগত কারণে ছাবাহার প্রকল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চীন পাকিস্তানে গোয়াদর বন্দর নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছে। বন্দরটি তৈরি হয়ে গেলে চীনের ঝিনঝিয়াং প্রদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে চীন-পাকিস্তান ইকনমিক করিডোরের মাধ্যমে। মুখে বাণিজ্যের কথা বললেও চীনের আসল উদ্দেশ্য ভারতকে ঘিরে ফেলা। অন্যদিকে দক্ষিণ চীন-সাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন নিয়ে জাপান যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। ছাবাহার বন্দর গোয়াদরের সমুচিত জবাব হবে বলে মনে করছে দুই দেশ। সাম্প্রতিক জাপান সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। পরে যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, দুই দেশই চায় দক্ষিণ চীন- সাগরের উত্তেজনা অবিলম্বে বন্ধ হোক। তবে তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন না করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাবাহার প্রকল্পে ভারত ইতিমধ্যেই ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

ভারতে কমবয়েসি ডায়াবেটিকের সংখ্যা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের ৫-১৬ বয়েসি দশ জন বাচ্চার মধ্যে অন্তত একজনের স্থূলতার কারণে ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা বেশি। সম্প্রতি অ্যাসোচেম হেলথ কমিটির একটি সমীক্ষা থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাচ্চাদের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার জন্য প্রধানত দায়ী উচ্চ ক্যালরি সম্পন্ন খাবার, জাঙ্কফুড, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ইত্যাদি। অ্যাসাচেমের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে ৭২ শতাংশ বাচ্চা নিয়মিত ব্যায়াম করে না। ৬৫ শতাংশ বাচ্চা স্থূলতার সমস্যায় ভুগছে। গ্রামের তুলনায় শহরে ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা বেশি। দিল্লীর ৬৯ শতাংশ বাচ্চার ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মুম্বাইয়ে সংখ্যাটা ৫৬ শতাংশ, হায়দরাবাদে ২৮ শতাংশ এবং কলকাতায় ২৩ শতাংশ। বিশ্ব ডায়াবেটিক দিবসের প্রাক্কালে জানা গেছে বিশ্বের মোট ৪২.২ কোটি ডায়াবেটিস রোগীর অর্ধেক বাস করেন ভারত চীন আমেরিকা ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ায়। অ্যাসোচেমের হেলথ কমিটি জানিয়েছে সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করালে ডায়াবেটিস সারিয়ে তোলা সম্ভব। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

সড়ক যোগাযোগ বাড়াতে মৈত্রী র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি ইন্ডিয়া গেটচত্বর থেকে একটি মৈত্রী কার র‍্যালির উদ্বোধন করলেন সড়ক পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুখলাল মান্ডব্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত চালিত মানিতিয়াকুলও। এই মৈত্রী কাররাালির উদ্দেশ্য ভারত মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের সড়ক পরিবহণ চুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সংস্থাকে ওয়াকিবহাল করা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে মান্ডব্য বলেন, এই কাররাালি তিন দেশের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং সড়ক পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরও বলেন, এই মৈত্রীর‍্যালির লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'র রূপায়ণে সাহায্য করা এবং এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে তোলা। দিল্লী ছাড়াও সারনাথ, বুদ্ধগয়া, পাটনা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, শিলং, কোহিমা এবং ইম্ফল থেকে পর্যায়ক্রমে এই কাররাালির আয়োজন করা হবে। এছাড়া মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন এবং থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্কক থেকে আয়োজিত হবে মৈত্রীর‍্যালি।

সেনাপ্রধানের নেপাল সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মধেসি ইস্যুতে বিতর্ক, সীমান্তে উত্তেজনা ইত্যাদি কারণে ভারত ও নেপালের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সাময়িক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। ঠিক এই সময় দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে বোঝাপড়া আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান দলবীর সিং সুহাগ তিনদিনের জন্য নেপাল সফরে যাবেন। তিনি নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী, প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকুমার দহল এবং সেনাপ্রধান রাজেন্দ্র ছেত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দু'দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক বেশ পুরনো এবং প্রায় ৩২,০০০ নেপালি গোর্খা বর্তমানে ভারতীয় সেনার গোর্খা রাইফেলসে কর্মরত। ১ লক্ষ ২৬ হাজার প্রাক্তন সেনাকর্মী এখন নেপালে থাকেন কিন্তু পেনসন পান ভারতীয় সেনার তরফ থেকে। সেনাপ্রধানের এই সফর প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন প্রয়াসের একটি অঙ্গ বলে জানিয়েছে সরকারি মহল।

হিন্দুর মৌলিক অধিকার রক্ষায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে গত ১২ নভেম্বর দুপুরে কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার থেকে এক বিশাল মিছিল বের হয়ে ধর্মতলায় রানী রাসমণি রোডে শেষ হয়। শেষে এক সভা হয়।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
21 November - 2016 - Rs. 10.00,

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।